প্রফেসর মিরাজ

(দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড)

সালেহ তিয়াস

প্রফেসর মিরাজ
সালেহ তিয়াস

প্রথম প্রকাশঃ ১ মে, ২০১৪ ইং
সংশোধিত প্রকাশঃ ৩ নভেম্বর, ২০১৪ ইং
প্রকাশনায়ঃ সেঁজুতি পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জাঃ
ফরহাদ আহমদ নিলয়

(বইটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত)

==

Professor Miraz
Written by Saleh Tias
Published By- Sejuti Publications
Facebook- www.facebook.com/sejutipdf
E-mail: sejutipdf@gmail.com
Web: www.sejutipdf.blogspot.com

(For Free Download)

প্রফেসর মিরাজ।
তাকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

তবে তার নামের আগে প্রফেসর কেন যুক্ত হল তা কেউ জানে না ! ইতিহাসে তার যতটুকু জীবনী পাওয়া যায় তাকে তিনি কোন প্রাইমারী স্কুলেও মাস্টারি করেছেন বলে মনে পড়ে না !!

তবে তিনি যদি দাবি করে থাকেন তিনি কোন এলিয়েনদের ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য ! কারণ তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই ! তবে আশার কথা হল– তিনি সেরকম কোন দাবী এখন পর্যন্ত করেন নি !

Please share this book on your wall after download.

Help us to grow up.

For more books, visit-

সেঁজুতি – একটি অনলাইন প্রকাশনা

প্রফেসর মিরাজের আশ্চর্য টাইম মেশিন

পূর্বকথা

খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আন্তর্জাতিক মিটিঙে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি প্রফেসর মিরাজ। সেখানে গিয়ে অন্য দেশের বিজ্ঞানীদের ইচ্ছামত চাপা মারা দেখে মুখ সামলাতে পারেন নি তিনি। ফস করে বলে ফেলেছেন যে 'হুহ, আপনারা আর কি পারেন, আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পারি'। ব্যস, আর যায় কোথায়। এমনিতেই ভবিষ্যৎ দেখা নিয়ে কথা, আবার বলেছেন বাংলাদেশের মত অনুন্নত একটা দেশের প্রতিনিধি, খবর কি আর বসে থাকে? দশ মিনিটের মধ্যে ইন্টারনেট আর খবরের কাগজের কল্যাণে পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ জেনে গেল, "টাইম মেশিন আবিষ্কার বাংলাদেশের বিজ্ঞানীর!"

মূল গল্প

ঘুম ভাঙ্গার পর খাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টাডিরুমে যেতেই মিরাজ দেখলেন, ওখানে বসে আছে কোট টাই পরা পাঁচজন বিদেশী।

আপনারা কারা ? এখানে এসেছেন কিভাবে ?

বিদেশীদের মধ্যে একজন পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, আমরা আমেরিকা থেকে এসেছি। আমরা জানি আপনি একটা টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছেন...

কি আবিষ্কার করেছি?

টাইম মেশিন।

কে বলল ?

আপনিই বলেছেন।

কখন ?

কালকে, একটা আন্তর্জাতিক মিটিঙে। আপনি বলেছেন, একটা কাগজ দেখে বলে লোকটা, 'হুহ, আপনারা আর কি পারেন, আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পারি।'

তার মানে কি এই যে আমি টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছি ?

স্যার আমরা পাঁচ লাখ ডলার দেব। আপনি ওটা আমাদের কাছে বিক্রি করে দিন।

হোয়াট!

দশ লাখ।

কি?

পনের লাখ।

আপনাদের কি মাথা খারাপ?

পঁচিশ লাখ।

মিরাজের ধারণা বদ্ধমূল হল, এরা প্রত্যেকেই বদ্ধ পাগল।
তবু পাগলদের সাথে একটু মজা করার লোভ তিনি সামলাতে পারলেন না।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমার যন্ত্রটা আমি নিয়ে আসছি।
জি স্যার, নিয়ে আসুন।
এখন যন্ত্র তো আনব, কিন্তু তার আগে একটু কনফিগার করতে হবে। আপনারা বলুন তো আপনারা ভবিষ্যতের কোন সময়টা দেখতে চান ?
তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমাদের দশ মিনিট পরের ভবিষ্যতটা আমরা দেখতে চাই স্যার।

মিরাজ মৃদু হাসলেন। বললেন, টাইম মেশিনের কাজ করার সময় স্থান কালের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক শক্তিক্ষয় হয়। আর সেটা মাঝে মাঝে খালি চোখেও দেখা যায়। ঐ যে দেখছেন, ছাদের দিকে একটা ঝুলন্ত ঝাড়বাতির দিকে নির্দেশ করেন মিরাজ, ঐ জিনিসটা প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তির আঁধার। ওখানে শক্তিক্ষয়ের দু একটা চিহ্ন আপনারা হয়তো দেখতে পারেন। তাই আমি চলে যাবার পর আপনারা ওটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন। একটুও চোখ সরাবেন না।
মিরাজ চলে গেলেন। পাঁচ বিদেশী ঝাড়বাতির দিকে তাকিয়ে রইলেন।
এক মিনিট গেল।
দুই মিনিট।
তিন।
চার।
পাঁচ। একজন একটু কাশি দিয়ে উঠলেন। সাথে সাথে আরেকজন তার মাথায় একটা গাট্টা মারলেন। মনোযোগে ব্যাঘাত!
ছয়।
সাত।
আট।
নয়। একটানা তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথা হয়ে গেল সবার। কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল না কেউই। যদি কিছু দেখা যায়।
দ...।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় স্টাডিরুমে প্রবেশ করলেন প্রফেসর মিরাজ।

আমার নতুন টাইম মেশিনে, হাসতে হাসতে বললেন তিনি, দশ মিনিট পরের সময়টা দেখা কোন ব্যাপারই না। তার হাতে তখন শোভা পাচ্ছে তার বেডরুমের নতুন বিশাল দেয়াল ঘড়ি!!!

আবারও প্রফেসর মিরাজের টাইম মেশিন

প্রফেসর মিরাজ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে একটা চিৎকার দিয়ে উঠলেন। স্ক্রিনে তার অনেক দিনের প্রতীক্ষিত হিজিবিজি দেখা যাচ্ছে। তার মানে তার মেশিন রেডি হয়ে গেছে। সেই মেশিন আবার যেন তেন মেশিন নয়। এটা হচ্ছে টাইম মেশিন। এটা দিয়ে অতীত ভবিষ্যৎ দুটোই চোখের সামনে দেখা যাবে।

আনন্দে তিন লাফ দিতে ইচ্ছা করল মিরাজের। কিন্তু বয়স বেড়েছে, ভুঁড়িও বেড়েছে সমানুপাতিক হারে। এখন কি তার বাচ্চাদের মত লম্ফঝম্প মানায় ? লাফ দেবার ইচ্ছাটা আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন তিনি।

কিন্তু তবুও নিজের উত্তেজনাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না মিরাজ। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিরলস সাধনার পর আজ তার টাইম মেশিন আলোর মুখ দেখেছে। এই মেশিনের জন্য তিনি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় অফার ছেড়ে দিয়েছেন, তার বউ সতের বছরের এক যুবকের হাত ধরে ভেগে গেছে। কিন্তু তবুও উদ্যম হারান নি তিনি, জানতেন একদিন তার পরিশ্রমের ফল মিলবেই।
আজ তাই মিরাজের জীবনের সবচেয়ে বেশি সুখের দিন।

কিন্তু মেশিন যে তৈরি হয়েছে এটা তো শুধু তিনিই জানেন, আর যতক্ষণ না অন্য কেউ পরীক্ষা করে দেখছে ততক্ষণ তো তিনি শিওর হতে পারেন না যে মেশিন আসলেই কাজ করবে কি না। সুতরাং, অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে তার অনেক সাধের টাইম মেশিনটাকে।
কিন্তু কাকে দিয়ে পরীক্ষা করা যায় ?

মিরাজের মাথায় প্রথমেই এল তার নাতনির বান্ধবী ছন্দার কথা।

ছন্দা আজ তাদের বাসায় আছে। ছন্দা মেয়েটা এমনিতে খুব ভালো, কিন্তু সে মিরাজকে দেখলেই দাদু দাদু করে চিল্লাপাল্লা করে। ব্যাপারটা মিরাজের একদমই পছন্দ নয়। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না তার বয়স যতই সত্তরের ঘরে হোক, তিনি আসলেই বুড়িয়ে গেছেন।
বাসার টেলিফোনে ফোন করে ছন্দাকে ডাকলেন তিনি। ছন্দা, একটু ল্যাবরেটরিতে এস তো। হ্যাঁ, একা আসবে।
ছন্দা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এল। কি দাদু ?
মিরাজর ভিতরটা বিষাক্ত হয়ে গেল। দাদু ? তাকে দেখে দাদু মনে হয় ?
তবু তিনি বললেন, শোন, আমি তো মেশিনটা বানিয়ে ফেলেছি।
কি মেশিন ?
টাইম মেশিন।
কি ?!?!

ছন্দা দীর্ঘক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করল সে।

টাইম মেশিন ? হা হা হা। হা হা হা। হা হা হা। টাইম...হা হা হা। মেশিন...হা হা হা।

মিরাজ তার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ছন্দার হাসি থামলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, টাইম মেশিন। আর আমি চাই, তুমি এটাকে পরীক্ষা করে দেখ।

আমি ? ছন্দা হাসতে হাসতে বলে।

হ্যাঁ। সমস্যা আছে ?

ছন্দা রাজি হয়। যদিও সে এখনও মিরাজর কোন কথাই বিশ্বাস করে নি। সে জানে, মিরাজর মাথায় একটু ছিট আছে।

আমাকে কি করতে হবে ?

মিরাজ একটা বড় যন্ত্র দেখিয়ে বলে, এর মধ্যে তোমার চোখ রাখতে হবে।

তাহলে কি হবে ?

তাহলে তুমি অতীত বা ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পাবে।

মানে...এবার একটু আগ্রহী দেখায় ছন্দাকে...আমি নিজে সেখানে যেতে পারব না ?

আপাতত সেটা আমি এখনও রেডি করিনি...তুমি শুধু দেখতে পাবে অতীত বা ভবিষ্যতে কি হচ্ছে...কিন্তু নিজে সেখানে যেতে পারবে না।

ছন্দা মনে হল কিছুটা বিশ্বাস করেছে। সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় চোখ রাখব ?

মিরাজ তাকে যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন। তারপর একটা কাঁচের জানালার মত একটা জিনিস দেখিয়ে বললেন, এখানে চোখ রাখ।

ছন্দা চোখ রাখল। কালো।

এখন কি ?

মিরাজ বললেন, তুমি কি ভবিষ্যত দেখতে চাও নাকি অতীত?

ছন্দা বলল, অতীত।

সময় এবং অবস্থান বল।

ছন্দা একটু ভেবে বলল, এই...আটশ মিলিয়ন বছর আগে।

অবস্থান ?

এখানেই।

মিরাজ যন্ত্রের বোতাম টেপাটেপি করতে লাগলেন। হঠাৎ যন্ত্রটা যেন জীবন্ত হয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগল। ছন্দা একমনে কালো জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে কি সত্যিই কিছু দেখা যাবে ?

****

ছন্দা চোখ খুলল। সে কোথায় ?

চারপাশে সাদা, শুধুই সাদা।

ছন্দার মনে হল যেন সে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে নিজের শরীরের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

চারপাশে শুধুই সাদা আর সাদা।
ছন্দার মনে হল সে বাতাসে অবস্থান করছে। আর তার নিচে বিস্তৃত সাদা অংশটি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ।
ছন্দা ভেসে ভেসে ভূপৃষ্ঠের আরও কাছাকাছি যেতে লাগল।
একসময় সে সাদা জিনিসটা চিনতে পারল।
সাদা জিনিসটা আসলে বরফ, এবং সে এই অদ্ভুত টাইম মেশিনের মাধ্যমে এমন একটা সময়ে চলে এসেছে, যখন পৃথিবীর এ অংশটি বরফে মোড়া ছিল।
আইস এজ !!
পাগলা দাদু মিরাজের অদ্ভুত টাইম মেশিন তাকে আইস এজের ছবি দেখাচ্ছে !
ছন্দা ভেসে ভেসে মাটিতে অবতরণ করল। কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে নিজের পা দেখতে পেল না সে।
আশ্চর্য হয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকাল সে। কিন্তু তার শরীরের জায়গায়ও কিছু নেই।
হঠাৎ কোথা থেকে বিশাল এক জন্তু তার পথের সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ে ছন্দার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মত একটা অনুভূতি হল।
জন্তুটা হঠাৎ চিৎকার দিয়ে তার দিকেই ছুটে আসতে থাকল।

অতীত ভ্রমণকারী ছন্দা চিৎকার দিয়ে উঠল। কিন্তু নিজের চিৎকার সে শুনতে পেল না। হাত দিয়ে মুখ ঢাকার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার হাতের জায়গায় কিছুই দেখতে পেল না বেচারি ছন্দা।
এক সেকেন্ড কেটে গেল।
দুই সেকেন্ড।
পাঁচ সেকেন্ড।
দশ সেকেন্ড।
কিছুই হল না।
ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল ছন্দা। দেখল, জন্তুটা চলে যাচ্ছে। ছন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে জন্তুটার বড় বড় পায়ের ছাপ।
তার মানে তার শরীরের (!) ভিতর দিয়েই জন্তুটা চলে গেছে।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ছন্দা। তার কাছে মনে হতে লাগল, নাহ, মিরাজ দাদু পাগল না, তার টাইম মেশিনটাও কোন পাগলের বায়স্কোপ নয়...তা আসলেই কাজ করে ! এবং ভালভাবেই কাজ করে।

****

যন্ত্রটার বিভিন্ন অংশ সংযোগকারী কিছু বের হয়ে থাকা তার সরিয়ে যন্ত্রটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ছন্দা।
অসাধারণ! দাদু...
মিরাজের মুখ কালো হয়ে গেল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করল ছন্দা।
সরি... অসাধারণ, প্রফেসর মিরাজ, অসাধারণ। আপনার যন্ত্র আসলেই অসাধারণ।

মুহূর্তেই সব ভুলে গিয়ে মুচকি হাসি হাসলেন মিরাজ। বললেন, কি কি দেখেছ ?
ছন্দা যা যা দেখেছে পুরোটা সবিস্তারে বলল।
মিরাজ বললেন, তুমি কি যা দেখেছ তা বিশ্বাস কর ?
ছন্দা বলল, অবশ্যই করি। হিসাব মোতাবেক আটশ মিলিয়ন বছর আগেই আইস এজ আসার কথা ছিল...এবং সেখানে সারা পৃথিবী বরফে মোড়া ছিল...ম্যামথ এর মত বড় বড় জন্তু ছিল...
মিরাজ বললেন, তার মানে আমার যন্ত্র একদম ওকে ?
হ্যাঁ, ওকে।
তুমি শিওর ?
ছন্দা ইতস্তত করে বলল, তবুও আরেকটু পরীক্ষা করতে দেবেন ?
কেমন পরীক্ষা ?
আপনি আমাকে ঠিক দশ মিনিট আগের অতীতটা দেখাতে পারবেন ? অবস্থান যদি এই ল্যাবরেটরিটাই হয় ? মানে...সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারতাম যন্ত্রটা আসলেই ঠিক কি না...
মিরাজ মুচকি হেসে বললেন, কেন পারব না ?
ছন্দা আবার যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে কালো জানালাটার দিকে তাকাল। মিরাজ কাজ শুরু করে দিলেন।

****

ছন্দা বেরিয়ে এল যন্ত্র থেকে। বিউটিফুল, শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠল সে।
কি হল ?
একদম পারফেক্ট, উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলল ছন্দা, আমি দেখলাম আমি আপনার সাথে কথা বলছি...কথাও একদম মিলে গেছে...আপনার যন্ত্র আসলেই অসাধারণ।
তারমানে তোমার আর সন্দেহ নেই যে আমার যন্ত্র ভুল করতে পারে ?
না।
সত্যি ?
হ্যাঁ।

মিরাজ গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মেয়েটাকে একটা কথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রথমবার মেয়েটি যখন আটশ মিলিয়ন বছর আগের দৃশ্য দেখতে চেয়েছিল...তখন তিনি “আটশ মিলিয়ন বছর অতীত” লিখতে গিয়ে মনের ভুলে “এক হাজার বছর ভবিষ্যৎ” লিখে ফেলেছিলেন।

প্রফেসর মিরাজের অতীত দর্শন

(প্রফেসর মিরাজের সাথে আপনারা সবাই কমবেশি পরিচিত। অবশ্য আমি ছাড়া উনার জীবন হাইলাইট করে লেখালেখি করার অন্য কোন লোক পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই, তাই আমার লেখা না পড়লে মিরাজের অদ্ভুত জীবন সম্বন্ধে কিছু না জানাই স্বাভাবিক।

যাহোক, কিছুদিন আগে মিরাজ এক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, টাইম মেশিনের লোভ দেখিয়ে কিছু লোভী আমেরিকানকে আচ্ছামত নাকানিচুবানি খাইয়েছিলেন তিনি। তারপর সেই কাহিনী ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার পর মোটামুটি ন্যাশনাল হিরোতে পরিণত হয়েছিলেন মিরাজ। আর কিভাবে তিনি কাজটি করেছিলেন তা নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম আমি। গল্পের নাম দিয়েছিলাম, "প্রফেসর মিরাজ ও তার টাইম মেশিন (!)"

আজ আমি আবার গল্প বলতে এসেছি, এবং তার মানেই হচ্ছে এরই মধ্যে প্রফেসর মিরাজ আবার নতুন কিছু ঘটিয়ে ফেলেছেন। তো পাঠক, বিছানায় আয়েশ করে পা উঠিয়ে বসুন এবং উপভোগ করতে প্রস্তুত হউন প্রফেসর মিরাজের আকর্ষণীয় নতুন কাহিনী।)

প্রযুক্তির উপর একটা আন্তর্জাতিক মিটিঙে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী প্রফেসর মিরাজ। এখানে এসে তিনি দেখলেন, সবাই যে যার মত চাপা মারছে। এক আমেরিকান বলছে তারা নাকি সি আই এ কে এত শক্তিশালী করবে যে এর পর থেকে অপরাধ করা লাগবে না, অপরাধের চিন্তা করলেই অপরাধীকে ধরে ফেলা যাবে (!)।

এক জাপানি বলছে তারা নাকি অদূর ভবিষ্যতে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সূর্যের উদয় আর অস্ত নিয়ন্ত্রণ করবে। এক উত্তর কোরিয়ান বলছে তারা নাকি এমন শক্তিশালী পারমাণবিক বোমা বানাবে যাতে পুরো পৃথিবীই ধাক্কা খেয়ে নিজের কক্ষপথ থেকে সরে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে গিয়ে পড়বে।

এসব গুলতাপ্পি শুনে মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না প্রফেসর মিরাজ। এত চাপাবাজি আর কাহাতক সহ্য করা যায় ? তিনিও বলে উঠলেন, হুহ, তোমরা আর কি পার, আমি অতীত দেখতে পারি।

ব্যস, দশ মিনিটের মধ্যে ইন্টারনেটের কল্যাণে সারা বিশ্ব জেনে গেল, বাংলাদেশের বিজ্ঞানী টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছে ন!

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে স্টাডিরুমের দরজা খুলেই মিরাজ আবিষ্কার করলেন, ওটা প্রতিদিনকার মত ফাঁকা নেই। ওখানে বসে আছে দশজন বিদেশী।

কি চাই ?

কোন রকম ভনিতা না করেই এক বিদেশী বলল, আপনার টাইম মেশিনটা দেখতে চাই।
টাইম মেশিন ? মানে ?
যেটা দিয়ে আপনি অতীত দেখতে পারেন।
আমি অতীত দেখতে পারি ? কে বলেছে ?
আপনিই বলেছেন। কালকে, প্রযুক্তির উপর একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।
তাই ? কি বলেছি ?
বলেছেন, নিজের হাতে ধরা একটা কাগজ দেখে লোকটা বলে, "হুহ, তোমরা আর কি পার, আমি অতীত দেখতে পারি"।

মিরাজ হেসে উঠলেন। তার মানে তোমরা ধরে নিলে...

স্যার, মুখ শক্ত হয়ে গেল বিদেশীদের, আপনি বলেছেন আপনি অতীত দেখতে পারেন। এবং তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের তার প্রমাণ দেখাতে হবে।
যদি না দেখাই?
তাহলে আপনাকে ইন্টারপোল ধরে নিয়ে যাবে।
উহ! বললেই হল? অভিযোগ?
এই অভিযোগে যে আপনি সারা বিশ্বের সামনে মিথ্যাচার করছেন ও মিথ্যা আইডিয়া ছড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। আপনার পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করা হবে। আপনার লেখা সমস্ত বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে...

মিরাজ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। এই প্রথম লাইসেন্স ছাড়া যেখানে সেখানে চাপা মারার জন্য নিজেকে নিজে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করল তার।

তো আমি এখন কি করব? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন মিরাজ।
শক্ত মুখের এক বিদেশী উত্তর দিল, ভিতরে যান, টাইম মেশিন নিয়ে আসুন, এবং আমাদেরকে অতীতের কোন একটা দৃশ্য দেখিয়ে প্রমাণ করুন আপনার কথা অসত্য নয়।

মিরাজ আমতা আমতা করতে লাগলেন। তার পা টলছে।

আর, নাটকীয় ভাবে বলে উঠলেন আরেক বিদেশী, দয়া করে আপনার বেডরুমের নতুন দেয়াল ঘড়িটা খুলে আনবেন না। নাটক করে আগেরবার পার পেয়েছেন, এবার আর পার পাবেন না।

মিরাজের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা এমন, কয়েক মাস আগে তিনি একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন। ব্যস, আর যায় কোথায়, সারা বিশ্বে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল তিনি নাকি টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছেন। সেই "টাইম মেশিন" কেনার জন্য আবার কিছু আমেরিকান তাকে পঁচিশ লাখ ডলার পর্যন্ত দিতে চাইল! তিনি বললেন, আপনারা কত বছর পরের সময় দেখতে চান? তারা বলল, দশ মিনিট পরের সময়! তিনি ঠিক দশ মিনিট পরে নিজের

বেডরুমের নতুন দেয়াল ঘড়িটা খুলে এনে আমেরিকানদের বললেন, দেখে নাও দশ মিনিট পরের সময় !! বোল্ড আউট হয়ে লেজ তুলে পালাল লোভী আমেরিকানরা।

সেবার তো নাহয় কোনভাবে পার পেয়েছিলেন মিরাজ, কিন্তু এখন? এখন তো অতীত দেখা নিয়ে প্রশ্ন...এখন তিনি কি করবেন ?

মিরাজ ভিতরে চলে গেলেন। কিছু একটা করতেই হবে, নাহলে মানসম্মান পাঙ্কচার।

ওদিকে মিরাজের স্টাডিরুমে বসা বিদেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এইবার পেয়েছি শালাকে। এবার দেখব সে কোথায় পালায়।

এক মিনিট গেল।

দুই মিনিট।

পাঁচ।

দশ।

এক ঘণ্টা।

দুই ঘণ্টা।

বিদেশীরা অধৈর্য হয়ে গেল। একজন বলল, ইন্টারপোলকে তাহলে রেডি হতে বলি ?
বল।
সে ইন্টারপোলের এজেন্টের নাম্বারে ফোন করল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে আসুন, পাখি খাঁচায়।
ইন্টারপোলের অফিসার মিরাজের বাসার দিকে রওনা দিলেন।

দশ মিনিট পরে খুলে গেল স্টাডিরুমের দরজা। বিদেশীরা দেখল, মিরাজ আর ইন্টারপোল কর্মকর্তা একসাথে দরজা দিয়ে ঢুকছেন।

কর্মকর্তা তাকে বলছেন, দাদু, আমার বউকে কন্ট্রোল করার রিমোটটা তাহলে কবে বানিয়ে দিচ্ছেন ?

আর মিরাজ তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলছেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাবে, খোকা !
বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল বিদেশীদের চোয়াল।
মিরাজ এবার বিদেশীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বলছিলে যেন ?
একজন আমতা আমতা করে বলল, আপনার টাইম মেশিন...
মিরাজ বললেন, টাইম মেশিন ? আমি কি কখনও বলেছি যে আমি টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছি ?

বিদেশীরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বলল, কিন্তু আপনি বলেছেন আপনি অতীত দেখতে পারেন...
হ্যাঁ পারি।
তাহলে সেটার প্রমাণ দেখান।
মিরাজ সেই বিদেশীকে ধরে স্টাডিরুমের জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। বাইরে দেখা গেল সকালের মিষ্টি রোদে প্রকৃতি আড়মোড়া ভেঙ্গে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে।
মিরাজ বললেন, সূর্যের দিকে তাকাও।

বিদেশী তাকাল।

কি দেখছ ?
সূর্য।
তার মানে হচ্ছে সূর্য থেকে তোমার চোখে আলো এসে পড়ছে, তাই না ?
বিদেশী মাথা চুলকে বলল, হ্যাঁ।
এবার কেউ একজন বল দেখি, বাকিদের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতক্ষণ লাগে?
সবচেয়ে ভ্যাবলা চেহারার বিদেশীটা উত্তর দিল, আট মিনিট আঠার সেকেন্ড।
গুড। তার মানে আমরা এখন যে সূর্যকে দেখছি, তা আসলে আট মিনিট আঠার সেকেন্ড আগের সূর্য।
কেউ কিছু বলল না। শুধু ভ্যাবলা মাথা নাড়াল, রাইট। ডেফিনিটলি রাইট।
তারমানে আমরা বর্তমানে অবস্থান করে আট মিনিট আঠার সেকেন্ড আগের দৃশ্য দেখলাম। রাইট ?
বলল ভ্যাবলা, হ্যাঁ, রাইট।
অর্থাৎ, নাটকীয়ভাবে বললেন মিরাজ, আমরা অতীত দেখলাম।

উপস্থিত সবার মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, বলে চললেন মিরাজ, পৃথিবীতে আমরা যত বস্তুই দেখি না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তুটা থেকে আলো আসতে খুব অল্প হলেও সময় নেয়। তার মানে আমরা যখন একটা বস্তু দেখি তখন আসলে সেটার খুব অল্প সময়, হয়তো সেকেন্ডেরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগ পূর্বের অবস্থাটা দেখি। অর্থাৎ, আমরা তার অতীত দেখি।

ভ্যাবলা বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগল।

মিরাজ ইন্টারপোল কর্মকর্তার দিকে দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখ, আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে। ওর শরীর থেকে আলোকে আমার চোখে আসতে হলে এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে হবে। এবং তাতে কিছু সময় ব্যয় হবে। হতে পারে সেটা এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, বা সামথিং লাইক দ্যাট।

তার মানে, ও হাসলে আমি তা দেখব সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর। অর্থাৎ, আমি ওর সেকেন্ডের ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পূর্বের অতীতটা দেখব। ক্লিয়ার?

কেউ কোন কথা বলল না।

তারমানে, আমি অতীত দেখতে পারি। তোমরাও পার।

এবারও কেউ কোন কথা বলল না।

মিরাজ ভুঁড়ি নাচিয়ে বললেন, সো জেন্টলম্যান, আমার কাজ আছে, আমি উঠি। উইশ ইউ গুড লাক।

বাকি সবাইকে হতবাক বসিয়ে রেখে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে এলেন খেয়ালি ও চাপাবাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর মিরাজ !

প্রফেসর মিরাজ ও বিশ্বসেরা দাবাড়ু

ঘুম ভেঙ্গে উঠেই প্রফেসর মিরাজ মোবাইলের নিউজ ফিডে খবর পেলেন, সারা পৃথিবীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে গেছে। সমস্ত মিসাইলের নিয়ন্ত্রণ এখন হ্যাকারদের হাতে।

মিরাজ ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। হায় হায়, এ তিনি কি শুনলেন ? এটা কি স্বপ্ন, না সত্যি ?

মিরাজ নিজের হাতে একটা রাম চিমটি কাটলেন। ভেবেছিলেন ব্যথা পাবেন না। কিন্তু ব্যথায় উহ করে উঠলেন তিনি। তার মানে এটা স্বপ্ন না, বাস্তব।

তাড়াতাড়ি পায়জামার ফিতা লাগিয়ে বাথরুমে গেলেন তিনি। পায়জামার ফিতা না খুলে শুলে তার ঘুম হয় না। তার নাকি গরম লাগে। এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

তার পায়জামার আবার চেন আছে। কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে সেই চেন খুলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন তিনি। কাজ শেষ করে আবার চেন আটকে চলে এলেন ব্রাশ করতে।

নিজের উদ্ভাবিত পেস্ট দিয়ে দুই মিনিট ধরে ব্রাশ করলেন তিনি। এটা তার নিজেরই বানানো, কিন্তু বিশেষ কারণে তা বাজারজাত করা যায় নি (বিশেষ কারণটা হচ্ছে, তার পেস্ট ব্যবহার করে দাঁতের সমস্যার হার শতকরা পঁচিশ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল)।

মুখ ধুয়ে আবার বেডরুমে এলেন মিরাজ। পিসিটা স্টার্ট দিলেন নেটে নিউজ দেখার জন্য।

কিন্তু তার পিসিটা আবার দুদিন ধরে নষ্ট। স্টার্ট সহজে হতে চায় না, নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে মনিটর আর সিপিইউতে বাড়ি দিলে মাঝে মাঝে উইনডোজ স্টার্ট পেজ পর্যন্ত শো করে। ব্যস, ও পর্যন্তই। আবার সিগনাল না দিয়েই হলুদ হয়ে যায় মনিটর, বন্ধ হয়ে যায় পিসি।

মিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কি করা যায় ? হ্যাঁ, ফোন দেয়া যায় তার প্রিয় বন্ধু মাল লু কে।

মাল লুর নাম্বারে ফোন দিতে দিতে স্টাডিরুমে ঢুকলেন মিরাজ। সাথে সাথে বিস্ময়ে হা হয়ে গেলেন তিনি।

ওখানে বসে আছেন সারা বিশ্বের বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান হাগামোতো প্রিশি।

****

প্রিশি মিরাজকে দেখেই একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। আরে মিরাজ ভাই, কি খবর ? কেমন আছেন ?

মিরাজ বললেন, ভালো...আপনি হঠাৎ এভাবে ?...কি মনে করে ?

প্রিশি গম্ভীর স্বরে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে মিরাজ ভাই। সারা বিশ্বের পুরো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে গেছে।

মিরাজ বললেন, হ্যাঁ, খবর পেয়েছি। তা এটা কারা করেছে জানেন কিছু ?

প্রিশি বললেন, কারা না, বলুন কে। এটা একজনেরই কাজ, আর তার নাম দমটম রুন্ন।

সে আবার কে ?

সে হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। সে আগে আমাদের সংস্থায় টেকনিশিয়ানের কাজ করত। মূলত যে সেকশনে মস্তিষ্কের সাথে সফটওয়্যার সংযোগ দেবার উপর গবেষণা চলছিল ও ওখানেই কাজ করত।

কয়েকদিন আগে সে পৃথিবীর সেরা দাবাড়ু সফটওয়্যার রেক্স ওয়ান চুরি করে। তারপর তার ল্যাবেই সবার অজান্তে নিজের মস্তিষ্কে লোড দেয় সফটওয়্যারটা। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তার ব্রেইন সেল জিনিসটাকে রিজেক্ট করে নি, বরং সেটার সাথে সহজেই অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছে।

সফটওয়্যারটা থাকার ফলে রুন্নর ব্রেইন এখন সেকেন্ডে হাজার হাজার লজিক বিশ্লেষণ করা শিখে গেছে। তাই এখন সে পৃথিবীর ইতিহাসে যত জটিল জটিল গাণিতিক সমস্যারই উদ্ভব হোক না কেন, সবই সল্ভ করতে পারে।

সে আগে হালকাপাতলা হ্যাকিং করত, দু একবার কয়েকজনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফাঁকা করে দেবার চেষ্টা করেছিল সে, আর এখন মাথায় এত বুদ্ধি নিয়ে সে লোভ সামলাবে কি করে ? প্রথম চান্সেই সরাসরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওয়েবসাইট হ্যাক করার চেষ্টা করেছে সে। বলা বাহুল্য, সফল হয়েছে সে ভালভাবেই।

মিরাজ বললেন, তো আমি কি করতে পারি ?

প্রিশি বললেন, আপনি ওকে থামান! ও যা শুরু করেছে তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো পৃথিবী ওর হাতের মুঠোয় চলে আসবে...হয়তো সে সবাইকে মেরে ফেলবে, বা ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবে...

মিরাজ একটু ভেবে বললেন, আমি ঠিক কি করব বলতে পারেন ?

প্রিশি অধৈর্য হয়ে বললেন, আপনি কি করবেন মানে ? আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আপনি পৃথিবীতে প্রথম ও একমাত্র টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছেন...

তাতে কি ?

তাই...হঠাৎ প্রিশি আর কোন কথা খুঁজে পেলেন না।

মিরাজ হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। বললেন, ও সম্ভবত আমার কাছে আসবে।

চমকে উঠলেন প্রিশি। কেন ? আপনি জানলেন কিভাবে ?

আমি জানি...আনমনা হয়ে উত্তর দিলেন মিরাজ। অনেক গুঁতিয়েও প্রিশি আর তাকে কথা বলাতে পারলেন না।

****

সারা পৃথিবী অধিকার করতে দমটম রুন্ন নামের মানুষটির লাগলো মাত্র পাঁচ দিন। এই কয়েকদিনে মিরাজকে দেখা গেল তার ল্যাবরেটরিতে সারা দিনরাত জেগে কি যেন খুটখুট করছেন।

ঠিক ষষ্ঠ দিনের মাথায় ঘুম থেকে উঠে মিরাজ নিজেকে একটা সুসজ্জিত কামরায় আবিষ্কার করলেন।

কি ব্যাপার ? তিনি এখানে কেন ?

একটু পরেই জবাব মিলল প্রশ্নের। মিরাজের কামরায় প্রবেশ করল একজন অচেনা মানুষ।

আপনি ?...মিরাজ প্রশ্নটা শেষ করলেন না। তিনি জানেন এ কে।

মানুষটা বলল, আমি দমটম রুন্ন। আপনি বোধহয় আমার কথা আগেই শুনেছেন।

মিরাজ মানুষটার বিনয়ে অবাক হলেন। সারা পৃথিবী যে মাত্র পাঁচ দিনে পদানত করেছে, তার চরিত্রের সাথে এমন বিনয় বেমানান।
আমি এখানে কেন ? আমার কাছে আপনি কি চান?
রুন্ন হাসল। বিষণ্ণ হাসি।
আমি চাই...আপনার টাইম মেশিনটা।
মিরাজের আশঙ্কা সত্যি হল। তিনি এটাই ভেবেছিলেন। তার মত বুড়োর কাছে সারা পৃথিবীর অধিপতির আর কিইবা চাওয়ার থাকতে পারে ?
মিরাজ বললেন, আপনি চেয়েছেন যেহেতু, আমি অবশ্যই দেব আমার টাইম মেশিন। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন ছিল।
রুন্ন বলল, বলুন।
মিরাজ বললেন, আপনি টাইম মেশিন দিয়ে কি করবেন ?
রুন্ন আবার হাসল। তারপর বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু আপনি নেহায়েত একজন বুদ্ধিমান মানুষ বিধায় আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। বুদ্ধিমানদের আমি পছন্দ করি।
বর্তমানে পৃথিবীর সব বড় বড় প্রযুক্তি আমার হাতে। আমি এই প্রযুক্তি নিয়ে চলে যাব বহু অতীতে, যে সময়ে মানুষেরও উদ্ভব হয় নি। সেখানে গিয়ে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের গোড়াপত্তন করব আমি, যাতে মানুষ শুরু থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে থাকে। আমি ও আমার বংশধরদের দিয়েই আবার যাত্রা শুরু করবে মানুষ। পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাস লেখা হবে অন্যভাবে।
মিরাজ অবাক হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিমান পাগলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে যদি সত্যিই অতীতে ফিরে যেতে পারে, এবং তার কথামত মানব সভ্যতা স্থাপন করতে পারে, তার মানে হচ্ছে, আজকে তিনি বা অন্য যারা পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আছেন তারা কেউই থাকবেন না। রুন্নকে যে কোন মূল্যে থামাতেই হবে!

মিরাজ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি পাবেন টাইম মেশিন। কিন্তু তার আগে আমার একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে আপনাকে।
চ্যালেঞ্জ ? কি চ্যালেঞ্জ ?
মিরাজ বলল, আপনি আমার বানানো একটা প্রোগ্রামের সাথে দাবা খেলবেন।
রুন্ন হঠাৎ হা হা করে হাসতে লাগল। দাবা!! মূর্খ মানুষ, তুমি জানো, পৃথিবীর সেরা দাবাড়ু সফটওয়্যারটি এখন আমার মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত ? আমাকে হারানো অসম্ভব এটা তুমি জানো ?
মিরাজ বলল, জানি। তবুও আপনাকে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে।
রুন্ন কৌতুক করে বলল, যদি না করি ?
মিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে বুঝব নিজের বুদ্ধির উপর আপনার আস্থা নেই।

রুন্ন ভ্রূ কুঁচকে মিরাজের দিকে তাকিয়ে রইল। তার আঁতে ঘা লেগেছে। এত বড় কথা? তার বুদ্ধিবৃত্তিকে অপমান! পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমান সফটওয়্যার যার মাথায় আছে তাকে অপমান!!

তারপর একসময় হাসি ফুটল তার মুখে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি রাজি। তোমার চ্যালেঞ্জটা বিস্তারিত বল।

মিরাজ বললেন, আমার প্রোগ্রামের সাথে আপনি দাবা খেলবেন। যদি জিততে পারেন, তাহলে টাইম মেশিন আপনার। আমি নিজ দায়িত্বে আপনাকে অতীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব। আর যদি হারেন বা ড্র করেন, তাহলে আমি আপনাকে টাইম মেশিনে করে আমার যে সময়টাতে ইচ্ছা সেই সময়ে পাঠিয়ে দেব। সেটা হতে পারে অতীত বা ভবিষ্যৎ। আর সাথে সাথে পৃথিবীকে আগের মত করে দিতে হবে। ইন্টারনেট থেকে আপনার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে ফেলতে হবে। যার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে এনেছেন তা ফেরত দিতে হবে। সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আগের মত করে দিতে হবে। শেয়ার বাজারও।

রুন্ন আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা বুঝতে সে ইচ্ছা করে একটু সময় নিচ্ছে।

মিরাজ আবার বললেন, আমার প্রোগ্রামের সাথে খেলার একটা শর্ত আছে। সেটা হচ্ছে, ইচ্ছা করে কখনই ভুল চাল দেয়া যাবে না। এমনকি যে চালটা সবচেয়ে বেশি লজিকাল, সেটা ছাড়া অন্য কিছুই দেয়া যাবে না।

রুন্ন বলল, কেন? আমি ভুল চাল দিলে তো তোমারই লাভ।

মিরাজ বললেন, আমার প্রোগ্রামটার আত্মসম্মানবোধ একটু বেশি। প্রতিপক্ষ ইচ্ছা করে ভুল চাল দিলে সে খেলা ছেড়ে উঠে যায়, গালাগাল দিতে শুরু করে।

রুন্ন হাসল। আচ্ছা ঠিক আছে। দেব না ভুল চাল। হয়েছে ?

মিরাজ বললেন, উহু, ওভাবে বললে হবে না। আমি নিজে আপনার প্রোগ্রামে এই পরিবর্তনটি ঘটাতে চাই। ভুল চাল দেবার ফাংশনটিই আমি মুছে দিতে চাই। শুধু তাই না, কোন চ্যালেঞ্জ আসলে আপনার প্রোগ্রাম যেন কখনও ভয় পেয়ে না খেলে চলে না যায় সে ব্যবস্থাও করতে চাই আমি।

রুন্ন বলল, তুমি যে এই সুযোগে প্রোগ্রামটা ধ্বংস করে দেবে না তার গ্যারান্টি কি?

মিরাজ বললেন, আপনি আপনার সকল সহযোগীকে দিয়ে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করবেন। কোন উল্টাপাল্টা করলে সাথে সাথে আমাকে নিরস্ত করবেন।

রুন্ন বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কথাই মেনে নিলাম। তুমি অনেক বুদ্ধিমান। কিন্তু সত্যি করে বল তো মিরাজ, তুমি আসলেই কি চাচ্ছ ?

মিরাজের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। মানুষটি অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান। সে কি বুঝতে পারছে মিরাজ কি চাচ্ছে ?

মিরাজ প্রোগ্রামের উপর তার কাজটি শেষ করে ফেললেন। পুরো সময়টা তাকে অনুসরণ করল রুন্ন বাহিনীর অসংখ্য রোবট।

একসময় জেগে উঠল রুন্ন। কাজ শেষ ?

হ্যাঁ শেষ।

তো কোথায় তোমার প্রোগ্রাম ?

তার জন্য আপনাকে আমার সাথে আমার ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে। আর হ্যাঁ, একা যেতে হবে।

রুন্ন কেন যেন রাজি হল। হয়তো মিরাজের ল্যাবরেটরিতে সে কোন বিপদের আশঙ্কা করে নি।

সে আর মিরাজ গেল মিরাজের ল্যাবরেটরিতে।

মিরাজ তাকে একটা ফাঁকা জায়গায় বসালেন। তারপর দেয়ালের কোথাও একটা বোতামে চাপ দিলেন। রুন্নর সামনে কোথা থেকে একটা বড় হলোগ্রাফিক স্ক্রিন হাজির হল। সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা দাবার বোর্ড, তাতে আবার দুইপক্ষের চৌষট্টিটা গুটি সুন্দরভাবে সাজানো।
রুন্ন জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোমার প্রোগ্রাম ?
মিরাজ বললেন, এই তো। এখানেই। বলে রুন্নর মাথার দিকে নির্দেশ করলেন তিনি।
মিরাজের কথাটাকে উচ্চমানের রসিকতা মনে করে হা হা করে হাসতে লাগল রুন্ন।

****

খেলা শুরু হল।
প্রতিপক্ষকে সরাসরি দেখার কোন সুযোগ এই খেলায় নেই। রুন্ন একটা চাল দিচ্ছেন, একটু পরে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে প্রতিপক্ষের গুটি নিজে নিজেই নড়ে একটা চাল সম্পন্ন করছে। অর্থাৎ, প্রোগ্রামটা চাল দিচ্ছে।
খেলার পাঁচ সেকেন্ডের মাথায় রুন্ন বুঝতে পারল, সে যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে খেলছে, সে কখনও ভুল চাল দেয় না। ঠিক তারই মত।
বিস্ময়করভাবে, তার খেলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীর খেলার আশ্চর্য মিল। অফেন্সে আশ্চর্য মিল, ডিফেন্সের স্টাইলও একই রকম।
দুজনেই একটু ডিফেন্সিভ খেলতে ভালবাসে। দুজনেই প্রতিপক্ষকে ভুলের সুযোগ দেয়।
এ যেন একেবারে নিজের সাথে খেলার মত !
রুন্ন একটু উল্টাপাল্টা খেলে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে চাইল। কিন্তু একটা ভুল খেলতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল, সে আর ভুল চাল দিতে পারছে না।
সঠিক চাল ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারছে না।

খেলা চলল ঠিক এক মিনিট। এরই মধ্যে উভয়েরই অসংখ্য চাল দেয়া হয়ে গেছে, একটা জায়গায় এসে উভয়েই আটকে গেছে, কারণ একই গুটি বারবার আগুপিছু করছে তারা। আর এজন্যেই খেলাটা প্রকৃত অর্থে আটকে গেছে।
আরও অসংখ্যবার একই ঘটনা ঘটার পর রুন্ন বুঝতে পারল, একটা ভুল চাল দেয়া ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।
কিন্তু ভুল চাল দেবার কোন উপায় তার নেই। ভুল চাল দেবার ফাংশনটিই আর নেই তার।
তার প্রতিপক্ষও কোন ভুল চাল দিচ্ছে না।
এখন এই অবস্থায় খেলা অমীমাংসিত ঘোষণা করা ছাড়া উপায় নেই।
অর্থাৎ, ড্র।
রুন্ন অনেকবার লজিক ডিডাকশন করে বুঝতে পারল, এখন ড্র ঘোষণা করাই সবচেয়ে “লজিকাল” কাজ। সে ড্র ঘোষণা করল।
ওপাশ থেকেও প্রস্তাবটি গৃহীত হল। অর্থাৎ, দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে ম্যাচটি ড্র হয়েছে।

রুন্ন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সে জানে বাইরে পৃথিবীতে এতক্ষণে আনন্দ উৎসব শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্রের উপর তার নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সব আগের মত হয়ে গেছে। তার লুণ্ঠন করা সমস্ত দ্রব্যাদি আস্তে আস্তে আসল মালিকদের কাছে চলে যাচ্ছে।

সে চ্যালেঞ্জে হেরে গেছে।

রুন্ন মিরাজের দিকে তাকাল। কিভাবে বানালে এই প্রোগ্রাম ? কিভাবে ? ভগ্ন স্বরে জানতে চাইল সে।

মিরাজ এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তিনি গিয়ে তার টাইম মেশিনের কয়েকটা বোতাম টেপাটেপি করলেন।

ঘড়ঘড় শব্দ করে জীবন্ত হয়ে উঠল টাইম মেশিন।

আস্তে আস্তে ল্যাবরেটরির মধ্যে একটা অস্বচ্ছ কাঁচের দেয়ালের মত তৈরি হল। সেই দেয়াল প্রচণ্ড শক্তিতে যেন আশেপাশের সবকিছুকে শুষে নিতে লাগল।

মিরাজ রুন্নকে দেয়ালটা দেখিয়ে বললেন, এটাই তোমার নিয়তি। যাও, চলে যাও। বর্তমান তোমাকে আর চায় না।

রুন্ন বলার চেষ্টা করল, যদি না যাই ? যদি তোমাকে এখনই খুন করে ফেলি ?

মিরাজ বললেন, দেখ রুন্ন, তুমি মানুষ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া তোমার মানায়। কিন্তু তোমার মাথার সাথে যে সফটওয়্যারটি লাগানো আছে সেটা কিন্তু যন্ত্র। সে কিন্তু মিথ্যা বলে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া তার কাছে আত্মহত্যার শামিল। তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তুমি ও তোমার সফটওয়্যার, উভয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে।

রুন্ন কিছু না বলে তাকিয়ে রইল।

মিরাজ বলল, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তোমারই সমস্যা। তোমাকে ধরার জন্য ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী রওনা হয়ে গেছে। তোমাকে হাতে পেলে তারা তোমায় কুত্তার মত মারবে নাকি শেয়ালের মত মারবে সেটা কি তোমার সফটওয়্যার বুঝতে পারছে না?

রুন্ন পরাজিতের মত কাঁচের দেয়ালটির দিকে যেতে শুরু করল। আর মুখে বিড়বিড় করতে লাগল, এটা তুমি কিভাবে করলে ? কিভাবে বানালে এই প্রোগ্রা ম? কিভাবে ?...

কাঁচের দেয়ালের কাছে গিয়ে বিষণ্ণ একটা হাসি উপহার দিল সে। তারপর বলল, আমি কোথায় যাচ্ছি এটুকু অন্তত জানতে পারি ?

মিরাজ বললেন, না। পারো না। কিন্তু শুধু একটা কথা মনে রাখবে, বাঁচতে হলে তোমাকে আবারও দাবা খেলতে হবে।

রুন্ন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিরাজের দিকে তাকিয়ে রইল।

ল্যাবরেটরির দরজায় দুমদুম ধাক্কাতে লাগল একদল মানুষ। রুন্ন, রুন্ন, ওপেন দি ডোর। প্রফেসর, ওপেন দি ডোর।

মিরাজ বললেন, Hasta la vista, Babe।

রুন্ন একটা বড় শ্বাস নিল। তারপর লাফ দিল কাঁচের দেয়াল লক্ষ্য করে।

কাঁচের দেয়াল প্রচণ্ড শোঁ শোঁ শব্দে শুষে নিল রুন্নকে। তারপর একটা বিদ্যুতচমকের মত উধাও হয়ে গেল ওটা।
দরজা ভেঙ্গে গেল। হুড়মুড় করে ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করল একদল সশস্ত্র পুলিশ।
রুন্ন কোথায় ? প্রফেসর, আপনি ঠিক আছেন তো ?
মিরাজ হাসলেন। দুশ্চিন্তার প্রহর কেটে গেছে, এখন না হাসলে হাসির অপমান হবে যে!
ও পালিয়েছে, বললেন তিনি।
পালিয়েছে ? দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল পুলিশ কর্মকর্তার কপালে, কোন পথ দিয়ে ? কখন ?
সময়ের পথ দিয়ে, রহস্যময় হেসে উত্তর দিলেন মিরাজ, ওকে আর আপনারা খুঁজে পাবেন না।

****

দশ মিনিট পর। সব পুলিশ চলে গেছে।
মিরাজ আস্তে আস্তে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগুতে লাগলেন। ওখানেই এতক্ষণ হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে খেলা হচ্ছিল।

জায়গাটার সামান্য পিছনে গিয়ে মেঝের উপর খুঁজে খুঁজে একটা আংটা বার করলেন তিনি। তারপর টান দিলেন আংটাটা ধরে।
ঘড়ঘড় শব্দে মেঝের একটা অংশ খুলে গেল।

ভিতরে অনেক নিচে একটা মেঝে দেখা গেল। ওখানে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল।
গোপন দরজাটা খোলার শব্দ পেয়ে উপরে তাকাল সে।
মানুষটার নাম রুন্ন।

রুন্ন বলল, আরে মিরাজ, তুমিও এসে গেছ ? টাইম মেশিনটা তোমাকেও টেনে এনেছে নাকি ? এটা কোন জায়গা ? কত সালে আছি আমরা ? আরে কি হয়েছে শোন, আমি এখানে আসার সাথে সাথেই একটা কম্পিউটার বলে উঠল, এখান থেকে বের হতে হলে নাকি তার সাথে দাবা খেলতে হবে। আমি তো ভাবলাম ঠিক আছে, আমাকে হারানো তো সম্ভব না, শুধু তোমার প্রোগ্রাম ছাড়া আর কেউই আমাকে হারাতে বা ড্র করাতে পারে নি। আমি তার সাথে খেলতে রাজি হয়ে গেলাম। তারপর দেখি কি, শালা কম্পিউটার ঠিক আমার মত খেলে। একদম ভুল চাল দেয় না। তারপর একসময় ড্র হয়ে গেল, কম্পিউটারই প্রথম ড্রয়ের প্রস্তাব দিল, আমারও রাজি না হয়ে উপায় ছিল না, আর তারপরই শালা কম্পিউটারটাও একদম চুপ হয়ে গেল, এখন তাড়াতাড়ি আমাকে উঠানোর ব্যবস্থা কর...

মিরাজ খুব সাবধানে পেছন থেকে তার রিভলভারটা বের করলেন। এটা তার ল্যাবেই থাকে সবসময়। ভিতরে গুলি আছে ছয়টা।

আজ এটার প্রথম ও শেষ ব্যবহার হবে।

পরিশিষ্ট

প্রফেসর মিরাজ যখন তার প্রিয় ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভুঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আমাকে এই কাহিনীটা বলছিলেন, তখন একটা জায়গায় বুঝতে না পেরে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা প্রফেসর, একটা জিনিস বুঝলাম না, রুন্ন টাইম মেশিনে ওঠার আগে কার সাথে খেলে ড্র করল ?

উনি হাতটা উনার নেয়াপাতি ভুঁড়ি থেকে সরিয়ে আমার মাথার উপর রাখলেন এবং বললেন, শোন, টাইম মেশিনে করে রুন্নকে আসলে কয়েক মিনিট অতীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাকে পাঠানো হয়েছিল ঐ ল্যাবরেটরিরই নিচের একটা গোপন কক্ষে, যেখানে আমি গত পাঁচ দিনে খেটেখুটে দাবা খেলার জন্য একটা কম্পিউটার সেট করেছিলাম। টাইম মেশিনে করে অতীতে আসা রুন্ন আসলে বর্তমানের রুন্নর সাথে খেলেছে, শুধু তাদের খেলাটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটা কম্পিউটার ও একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের মাধ্যমে। যেহেতু দুই রুন্নই আসলে এক, তাই দুজনেই একই রকম খেলেছে, দুজনের কেউই ভুল চাল দেয় নি, আর তাই খেলাটা ড্র হয়েছে। কম্পিউটারের কাজ ছিল খালি এর চাল ওকে আর ওর চাল একে দেয়া, কিন্তু এমনভাবে খেলাটা দেখানো হয়েছে যে দুজনেই মনে করেছে তারা কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাথে খেলছে।

আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই টাইম মেশিনের ব্যাপার স্যাপার তেমন একটা ঢুকল না। আমি বললাম, আমি না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু পাঠকরা ?

প্রফেসর একটা দিলখোলা হাসি হেসে বললেন, সব পাঠকদেরই রহস্যময় জিনিসের প্রতি একটু বেশী আগ্রহ থাকে। তোমার ভয় নেই, না বুঝলেও পাঠকরা তোমার গল্প ফেলে দেবে না।

প্রফেসর মিরাজ ও একটি ধাঁধাঁ

আপনারা কি জানেন আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মিরাজকে ভিনগ্রহবাসীরা একবার কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল? সেখান থেকে উনি কিভাবে বেঁচে ফিরেছিলেন সেটা কি কেউ জানেন? আমার তো মনে হয় জানেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, না জানলেও সমস্যা নেই। আগে জানতেন না, আজকে জানবেন। আজকে আমি আপনাদের সেই গল্পটাই শোনাতে এসেছি।

মিরাজ একবার পুরো সপ্তাহের বাজার করে রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন, এমন সময় তার চারপাশে হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে লাগল। কারেন্ট শকের মত ঝি ঝি শব্দ হতে লাগল আশেপাশে। মিরাজ তার স্বভাববশত প্রথমে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না। তিনি ভাবলেন হয়তো কোন প্রাকৃতিক কারণে এসব ঘটছে, হয়তো একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কে জানত যে ঠিক ঐ সময়ে মুহূর্তে পৃথিবীতে ভিনগ্রহবাসীদের একটা স্পেসশিপ অবতরণ করছিল। আর সেজন্যেই ঐ অদ্ভুত জিনিসগুলো ঘটছিল !

মিরাজ আরেকটু সামনে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। তার চারপাশে রচিত হয়েছে ভিনগ্রহবাসীদের শক্তিবলয়। এখন আর পালাবার উপায় নেই।
মিরাজের সামনে একটু পরেই হঠাৎ যেন শূন্য থেকে উদয় হল একটা বিশাল মহাকাশযান। সেটার পরিধি এত বড় যে তার জন্য আর আকাশ দেখা গেল না। আস্তে আস্তে মাটিতে অবতরণ করল ওটা।
একটু পরে সেখান থেকে নেমে এল তিনজন ভিনগ্রহবাসী। তাদের প্রত্যেকের হাতে আবার বন্দুকের মত কি যেন একটা জিনিস।

তিনজনই সোজা মিরাজের দিকে এগিয়ে এল। মিরাজ দৌড় দিয়ে ছুটে পালানোর একটা পৈশাচিক ইচ্ছা কোনভাবে দমন করলেন। এখন দৌড় দেয়া মানেই মৃত্যু।
মিরাজের কাছে এসে তারা মিরাজকে শুঁকে দেখল। ভুঁড়ি টিপল। পেটের পরিধি মাপল। দুই কানের মধ্যে আলো ফেলে দেখল। দুই পায়ের দৈর্ঘ্য মেপে সমান হয়েছে দেখে আশ্চর্য হয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল।

মিরাজ মনে মনে বলতে লাগলেন, হ, হইসে, এইবার যা। ভাগ। কাতুকুতু লাগে।
সাথে সাথে তারা মিরাজের পেটে কাতুকুতু দিতে লাগল। মিরাজ হা হা হে হে হো হো করে হেসে উঠলেন। ভিনগ্রহবাসীরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর হাতের বন্দুকের মত জিনিসটা মিরাজের মুখে ঠেকিয়ে ফায়ার করল একজন ভিনগ্রহবাসী। মিরাজ ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন।
কিন্তু না। তেমন কিছুই ঘটল না। বরং মিরাজের মনে হল, তার মুখে কেউ যেন লেবু টিপে দিয়েছে।

জিনিসটা খেয়ে জিহবা দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন মিরাজ। জিনিসটার টেস্ট ভালোই। তিনি ভাবলেন, হয়তো চাইলে আরেকটু পাওয়া যাবে।

কিন্তু একটু পরেই তিনি টের পেলেন, তার ঘুম পাচ্ছে। গভীর ঘুম। তিনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। ভিনগ্রহবাসীরা তাকে তুলে নিয়ে গেল তাদের স্পেসশিপে।

তারপর যেভাবে পৃথিবীতে হঠাৎ করে এসেছিল সেভাবে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল মহাকাশযানটা।

****

ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রফেসর মিরাজের। তিনি দেখলেন, তার উপর ঝুঁকে রয়েছে বিশালদেহী এক ভিনগ্রহবাসী।

তার বেশ কয়েকটা হাত, বেশ কয়েকটা পা (এদের মধ্যে এক বা একাধিক জননাঙ্গ কাম মুত্রাঙ্গও থাকতে পারে), সাথে বেশ কয়েকটা শুঁড়। তার মাথাটা অনেক বড়, কিন্তু সে তুলনায় পেটটা একদমই ছোট।

মিরাজ মাতৃভাষা বাংলায় গালি দিয়ে উঠলেন, আমারে এইখানে ধইরা আনসশ ক্যান হারামজাদা ?
ভিনগ্রহবাসী খ্যাঁক খ্যাঁক করে একটা শব্দ করল। তারপর স্পষ্ট বাংলায় বলল, তোরে ধইরা আনসি কারণ তোরে আমরা খুইলা খুইলা দেখমু। তারপর তোর চামড়া দিয়া মুজা বানামু।
মিরাজ ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন, অ্যাঁ !! তুমি বাংলা জানো ?
ভিনগ্রহবাসী আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে শব্দ করল। এটা তার হাসির শব্দ হবার ভয়ানক সম্ভাবনা রয়েছে। জানি না আবার ? সব ভাষা জানি। কারণ আমাদের আছে "ফু-গোল ট্রান্সলেটর"! দুই তিনটা হাত তুলে আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল সে।
মিরাজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ফু-গোল ট্রান্সলেটর! সেইটা আবার কি ?
ভিনগ্রহবাসী বলল, কেন, তোমাদের যদি গু-গোল ট্রান্সলেটর থাকতে পারে, আমাদের ফু-গোল ট্রান্সলেটর থাকতে পারবে না কেন বল দিকিনি বাপু ?

মিরাজ কাহিনীটা ধরতে পারলেন। পৃথিবীতে কয়েক বছর আগে গু-গোল নামের এক কোম্পানি ইন্টারনেটে নতুন একটা ট্রান্সলেটর খুলেছে, আর তার নাম দিয়েছে গু-গোল ট্রান্সলেটর। এর মাধ্যমে এক ভাষার বাক্য বা শব্দ অন্য ভাষায় সহজেই অনুবাদ করা যায় বলে তারা দাবি করেছে, কিন্তু মিরাজের মনে হয়েছে পুরোটাই আসলে তাদের ভাঁওতাবাজি।

একবার কলিগদের গুঁতোগুঁতিতে তিনিও গু-গোল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, সেখানে বাংলায় তিনি ইনপুট দিয়েছিলেন, "মিরাজ একজন ভালো মানুষ"।

কিন্তু সেটাই ইংরেজিতে কি এসেছিল জানেন ? "Miraj is a good review"!!! সাথে সাথে মেজাজ খারাপ করে চলে এসেছিলেন মিরাজ। তিনি good review! ফাইজলামি নাকি ? গুল্লি মারি গু-লম্বা...সরি...গু-গোল ট্রান্সলেটররে র !!

মিরাজ বললেন, আমাদের গু-গোল ট্রান্সলেটর তো পুরাই ফাউল। পুরাই জাইরা, বয়া কাম নাই। কিন্তু তোমাদের ফু-গোল ট্রান্সলেটর তো ভালোই মনে হইতেছে। ভালোই তো বাংলা বলতেছ তুমি।
ভিনগ্রহবাসীর বুক গর্বে তিন ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠল। এদের গ্রহে হয়তো এই নিয়ম। কেউ গর্ববোধ করলে তার বুক হয়তো আসলেই কিছুটা ফুলে ওঠে।

ভিনগ্রহবাসী বলল, তোমারে আমার ভালো ঠাহর হইতেছে। থাক, তোমারে আজকে কাটমু না। আজকে তুমি রেস্ট নাও। কালকে কাটমুনে।
মিরাজ দার্শনিকের মত ভাবলেন, নাহ, জীবনটা তাহলে একদিন প্রলম্বিত করা গেল। ভালোই তো।
তিনি বললেন, আমারে তো কাইটাই ফেলবা, তো তার আগে আসো কিছু সুখদুঃখের গল্প কইরা নিই।
ভিনগ্রহবাসী বলল, আইচ্ছা। তুমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বল কি বলবা।
মিরাজ প্রশ্নে প্রশ্নে বের করে ফেললেন যে, এই ভিনগ্রহবাসীরা ভেগা নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহ "ক্যাটওয়াক ওয়ান" থেকে এসেছে। এদের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ছিল একটা বুদ্ধিমান জীবের নমুনা সংগ্রহ করা, তারপর তাকে কেটেকুটে তার শারীরিক গঠনটা দেখা। এরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক উন্নত, তবু এদের জ্ঞানের গণ্ডিকে নিজেদের সৌরজগতের বাইরে প্রসারিত করার জন্যই এদের পৃথিবীতে আগমন।
মিরাজের সাথে যে ভিনগ্রহবাসী কথা বলছে সে এই স্পেসশিপের সর্বাধিনায়ক ইবা বিরকু। তার বয়স মাত্র তিন হাজার পাঁচ সৌর বছর। সে বাসা থেকে পালিয়ে এসে এই মহাকাশযানের দায়িত্ব নিয়েছে, কারণ বাসায় বাবা মা নাকি তাকে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে ভিডিও গেম খেলতে দিত না। আর সেজন্যেই অভিমানে ঘর ছেড়েছে ইবা বিরকু, বেছে নিয়েছে মহাকাশচারীর জীবন।

ইবা বিরকুর মন খারাপ, কারণ সে তার চেয়ে এক হাজার বছর বড় যে মেয়েটাকে (মানে বিপরীত লিঙ্গধারিকে) মনে মনে পছন্দ করে, তার বাবা তাকে বলেছে যে কোন বুদ্ধিহীনের সাথে সে তার মেয়েকে বিয়ে দেবে না। ইবা বিরকু যখন প্রেমিকার বাবাকে খুব ডাঁট মেরে বলেছে যে আপনি কি দেখে বুঝলেন যে আমার বুদ্ধি নেই ? তখন সেই প্রেমিকার বাবা তাকে একটা ধাঁধাঁ ধরে বলেছে যে পঞ্চাশ ক্যাটওয়াকিয় ঘণ্টার মধ্যে এই ধাঁধাঁর সমাধান না দিতে পারলে সে তার মেয়েকে আর ইবা বিরকুর সাথে বিয়ে দেবে না। আর সেই ধাঁধাঁটার সমাধান হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না ইবা বিরকু। ওদিকে চল্লিশ ক্যাটওয়াকিয় ঘণ্টা ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। তাই টেনশনে টেনশনে এখন ইবা বিরকুর মন খারাপ।

মিরাজ ভাবলেন, পাইসি রে সুযোগ! যদি ধাঁধাঁটার সমাধান আমিই করে দিতে পারি তাহলে তো কেল্লাফতে! তাহলে ও আমাকে মুক্ত করে দেবে! আমি বেঁচে যাব!
মিরাজ বুদ্ধিজীবী টাইপ একটা ভাব নিয়ে বললেন, ধাঁধাঁটা বল দেখি শুনি।

ইবা বিরকু বলল, শুনবা ? তাহলে শোন। ধাঁধাঁটা হচ্ছে, শুঁড় দিয়ে একটু মাথা চুলকে নেয় ইবা বিরকু, কি যেন মনে করার চেষ্টা করে সে...*"ধর, একটা লোক হয় সত্যবাদী নাহলে মিথ্যাবাদী। মানে সে হয় শুধু সত্য কথা বলে নাহলে শুধু মিথ্যা কথা বলে। তাকে শুধু একটা প্রশ্ন করে বের করতে হবে যে সে সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। প্রশ্নটি কি ?"*

মিরাজের মাথায় জট পাকিয়ে যায়। সত্যবাদী...মিথ্যাবাদী...মিথ্যাবাদী...সত্যবাদী...হঠাৎ করেই হ্যাং হয়ে যায় মিরাজের মস্তিষ্ক। আর কাজ করে না সেটা।
ইবা বিরকু ভয় পেয়ে যায়। কি হল তোমার?
একটু পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন মিরাজ। অ্যাঁ! কি? কি?
ইবা বিরকু বলে, পারবে তুমি? পারবে?
মিরাজ আকাশ থেকে পড়েন। কি পারব?
ইবা বিরকু বলে, আমার ধাঁধাঁর সমাধান। পারবে? প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে।
মিরাজের আবার সব মনে পড়ে যায়। ***..."ধর, একটা লোক***
হয় সত্যবাদী...মিথ্যাবাদী...সত্যবাদী...মিথ্যাবাদী...?!?"

মিরাজ জানতেন তিনি পারবেন না। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি ? তাছাড়া, এটাই তো তার বাঁচার একমাত্র উপায়।
তিনি ইবা বিরকুকে বললেন, পারব না মানে ? অবশ্যই পারব। কেন পারব না ? একদম সহজ, পানির মত সহজ, এটা তো আমার পাঁচ মাসের নাতিও পারবে... যা হোক, আমি ক্লান্ত। ক্ষুধাও লেগেছে প্রচণ্ড। আমাকে চট করে দুই গামলা ভাত আর রুই মাছ দিয়ে যাও তো দেখি !
ইবা বিরকু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আমরা তো ভাত খাইনা, টাত খাই। টাত খাবে ?
মিরাজের তখন পেটে ছুঁচোর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছে। তার কাছে তখন ভাত-টাত-কুত্তা-হিমালয় পর্বত সব এক। তিনি বললেন, আরে মিয়া দাও না ভাত টাত যা আছে সব দাও!
একটু পরেই ভোজনরসিক মিরাজকে সামনে দুটো বড় বড় গামলা নিয়ে গপগপ করে "টাত" খেতে দেখা গেল।

****

খাওয়া শেষ হবার পর মিরাজ বললেন, কই হে, একটা বিছানা বালিশ কিছু দাও। আর কিছু সুন্দরীকে খবর দাও, গা টা বড় ম্যাজম্যাজ করছে।
একটু পরে তার জন্য একটা দড়ি এল। মিরাজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এটা কি ?
ইবা বিরকু বলল, এটা আমাদের ঘুমের সময় লাগে। এটা পায়ে বেঁধে আমরা উলটো ঝুলে ঘুমাই।
মিরাজ বললেন, একটা বিছানা বালিশ...
ইবা বিরকু বলল, সেইটা আবার কি? খায় না মাথায় দেয়?
মিরাজ মজা করে ঘুমানোর আশা ত্যাগ করলেন। নাহ, আপাতত শক্ত মেঝের উপরই ঘুমাতে হবে তাকে।
ইবা বিরকু বলল, আমার ধাঁধাঁ কখন সমাধান করে দিচ্ছ ?

মিরাজ বললেন, এই তো, বেশী সময় লাগবে না।
ইবা বিরকু বলল, কত সময় ?
মিরাজ এক তুড়িতে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললেন, এই তো, মাত্র এক সপ্তাহ।
ইবা বিরকু বলল, এক সপ্তাহ ! তাহলে তোমাকে কাটব কখন ?
মিরাজ বললেন, কাটবে মানে ? কাটবে কেন ? আমি তোমার ধাঁধাঁর সমাধান করে দিলে আমাকে সসম্মানে পৃথিবীতে রেখে আসতে হবে। আর সাথে আমি আরও যা চাইব সব দিতে হবে।
ইবা বিরকু আঁতকে উঠল, অ্যাঁ! তাহলে আমাদের আন্তঃগ্রহীয় গবেষণার কি হবে ? অন্য গ্রহবাসীদের শরীরে কি আছে সেটা আমরা দেখব কিভাবে ?
মিরাজ বললেন, তোমার কাছে কে বড়? আন্তঃগ্রহীয় গবেষণা? নাকি তোমার গার্লফ্রেন্ড?
ইবা বিরকু লজ্জিত মুখে বলল, অবশ্যই গার্লফ্রেন্ড !
মিরাজ বলল, তাহলে আমার কথা মেনে নাও, হাঁদারাম! আমাকে কেটে ফেললে তুমি গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করবে কিভাবে ? তোমাকে ধাঁধাঁর সমাধান কে বলে দেবে তোমাকে ?
ইবা বিরকু শুঁড় দিয়ে গাল চুলকাল। আসলেই তো! কথা তো ঠিকই!
সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে তাহলে কাটব না...কিন্তু আমার হাতে তো বেশী সময় নেই। আর মাত্র দশ ক্যাটওয়াকিয় ঘণ্টা আছে।
মিরাজ বললেন, আমাদের হিসাবে সেটা কত সময় ?
ইবা বিরকু বলল, অ্যাঁ...অ্যাঁ...অ্যাঁ...একটা ক্যালকুলেটর লাগবে...দাঁড়াও নিয়ে আসি...
মিরাজ হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই ভিনগ্রহবাসীটি একদমই বুদ্ধিহীন। সে যে নিজের ধাঁধাঁর সমাধান নিজে বার করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।
কিন্তু তিনিও কি পারবেন ? চ্যালেঞ্জ তো না বুঝেই নিয়ে নিলেন তিনি।
একটু পরেই ইবা বিরকু এসে বলল, হ্যাঁ, পেয়েছি। তোমাদের হিসাবে দুই ঘণ্টা।
ভয়ে মিরাজের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। দুই ঘণ্টা! মাত্র দুই ঘণ্টা! অথচ তিনি ভেবেছিলেন ধীরে সুস্থে আয়েশ করে সমাধান করবেন...অবশ্য যদি পারেন আর কি...
মিরাজ শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার বাঁচামরা নির্ভর করছে আগামী দুই ঘণ্টার উপর। গার্লফ্রেন্ডকে না পেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে ইবা বিরকুর কোন স্বার্থ নেই।

জীবনে অনেকদিন পর ভয় পেলেন মিরাজ। মৃত্যুর ভয়। প্রচণ্ড ভয়। ভয়ে পাতলা পায়খানা হতে লাগল মিরাজের।

এই মহাকাশযানে পাতলা পায়খানা হওয়া আবার আরেক সমস্যা। ক্যাটওয়াক গ্রহের অধিবাসীরা আবার পায়খানা করে না, তাদের পায়ুপথ দিয়ে ধোঁয়া জাতীয় বায়বীয় এক ধরণের বস্তু নির্গত হয়। ব্যস, তাতেই ওদের পেট পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং, টয়লেট নামের কোন বস্তুর কথা এরা জীবনেও শোনে নি।

এদিকে মিরাজ পড়লেন মহা সমস্যায়। কার্যসাধন করার মত কোন জায়গাই নেই আশেপাশে। তো এখন কি করা যায় ?

অনেক কষ্টে ব্যাগ জাতীয় একটা বস্তু জোগাড় করতে সক্ষম হলেন মিরাজ। তারপর ফাঁকে দিয়ে সম্পাদন করলেন কার্য।
কাজ শেষ করে ব্যাগটা নিয়ে ফেলে দিতে যাবেন, এমন সময় মিরাজ দেখলেন, এক ভিনগ্রহবাসী গভীর আগ্রহ নিয়ে তার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন লোলুপ তার দৃষ্টি। যেন কত যুগের সঞ্চিত কামনা ঝরে পড়ছে ও দুচোখ হতে।
মিরাজ তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে এলেন। বলা যায় না, যদি দেখতে চায় ? তাতেও যদি সন্তুষ্ট না হয় ? যদি একটু ধরে দেখতে চায় ? বা চেখে দেখতে চায় ?
এদিকে প্রাকৃতিক বেগের কারণে ঠিকমত ধাঁধাঁর সমাধানের কথা চিন্তাও করতে পারলেন না তিনি। এক ঘণ্টায় তিনি তিনবার টয়লেটে গেলেন। কিন্তু সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে পারলেন না একটুও।
ইবা বিরকু এসে খবর নিয়ে গেল একবার। মিরাজ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো, বের হয়ে গেছে।
ইবা বিরকু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, না, আমি ধাঁধাঁটার কথা বলছিলাম।
মিরাজ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও হয়ে গেছে। আরেকটু সবুর কর।
ইবা বিরকু চলে গেল।

সত্যবাদী...মিথ্যাবাদী...সত্যবাদী...আবার প্যাঁচ খেয়ে গেল মিরাজের মাথায়। এ কি ধাঁধাঁরে বাবা! একজন যদি সত্য বা মিথ্যা যেকোনো কিছুই বলতে পারে, তাহলে এমন কি কোন প্রশ্ন আছে যেটা তাকে করলে বোঝা যাবে সে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে ?

যদি তাকে যেকোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, যেমন তোমার রাতে ঘুম হয় কিনা, তোমার নাম আব্বাস কিনা, তুমি অন্তর্বাস পড়েছ কিনা, তাহলে তো সে হ্যাঁ-ও বলতে পারে, না-ও বলতে পারে। তাহলে সেই উত্তর থেকে কিভাবে বোঝা সম্ভব যে সে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা বলছে ?

মিরাজের আবার টয়লেট লাগল। ধেত! “টাত” খেয়ে তো পেটের পুরো বারোটা বেজে গেছে। খোদাই জানেন কি মিশিয়ে রেখেছে শালা ভিনগ্রহবাসীরা!

মিরাজের কাজ সারতে লাগল দশ মিনিট। এসে হাত না ধুয়েই আবার ভাবতে বসলেন মিরাজ।

বিশ মিনিট কেটে গেল।
আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

ইবা বিরকু আবার এসে ঘুরে গেল। তার চোখ ফোলা ফোলা। কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বলল, আমার গার্লফ্রেন্ড ফোন করেছিল। সে বলল, তার বাবা নাকি কোন প্রাইম মিনিস্টারের নাতির বড় ভাইয়ের কাজিনের মামাশ্বশুরের মেয়ের জামাইয়ের পুত্রবধূর ননদের এক্স বয়ফ্রেন্ডের ভাগ্নের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেছে। আর মাত্র একঘণ্টা পরেই নাকি তারা ওকে দেখতে আসবে।

ইবা বিরকু আরও বলল, সে নাকি বলেছে ইবা বিরকু ধাঁধাঁর সমাধান দিতে না পারলে সে রাগে ইবা বিরকুর সাথে আর কথা বলবে না। একটা সাধারণ ধাঁধাঁর উত্তর যে পারে না তার সাথে ঘর করার কোন খায়েশ নাকি তার নেই।

ইবা বিরকু আরও বলল, সে নাকি বলেছে, ইবা বিরকুকে সে অনেক অনেক ভালবাসে। অনেক আদর করে। তার প্রতি অনেক অনেক চুম্মা...এটুকু বলতে গিয়েই ইবা বিরকু তিনবার হেঁচকি খেল। তার নাকের দু ফুটো দিয়ে সমানে গড়াতে লাগল জল। মিরাজ ভাবলেন, আহা! একেই বলে প্রেম!
মিরাজ আবার ধাঁধাঁর উত্তর নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। সত্যবাদী...মিথ্যাবাদী...ধুর ছাই ছাতামাথা এইগুলা কোন ধাঁধাঁ হইল ?

মিরাজ কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। তাকে বোধহয় মরতে হচ্ছেই। আচ্ছা মরার পর ব্যাপারটা কেমন হবে ? প্রথমে হয়তো এরা তার চামড়া ছিলবে, তারপর হাড্ডিগুড্ডি সরাবে, তারপর ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখবে...এই প্রথম একটা মহৎ কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মত একটা উচ্চমার্গীয় ভাবনায় আপ্লুত হলেন মিরাজ। নাহ, এ ক্ষুদ্র জীবনটা তো আর বৃথা যাবে না, অন্তত কারও শিক্ষার জন্য তা ব্যয় হবে। এ-ই বা কম কি ?

আবেগে তারও চোখে পানি চলে এল। আহা, ভিনগ্রহবাসীরা যদি তাকে না পেত, তাহলে হয়তো অন্য কাউকে ধরে নিয়ে যেত। তিনি আসলে সেই অন্য কারও জীবন বাঁচিয়েছেন। আহা, কত মহৎ একটা কাজই না তিনি করেছেন!

আবেগে চোখে টলটলা জল নিয়ে তিনি আবার কার্যসম্পাদন করতে ফাঁকায় গেলেন। তার হাতে আর সময় আছে আর মাত্র দশ মিনিট।
ফিরে আসার সময় হঠাৎ একটা আয়না চোখে পড়ল তার। তিনি আয়নার দিকে তাকালেন। আয়নার ভিতর থেকেও একজন মিরাজ তার দিকে তাকাল।
তিনি বললেন, সত্যবাদী।
আয়নার ভিতরের মিরাজও বলল, সত্যবাদী।
তিনি বললেন, মিথ্যাবাদী।
আয়নার ভিতরের মিরাজও বলল, মিথ্যাবাদী।
দুই মিরাজ ভ্রূ কুঁচকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। কেটে গেল দুই মিনিট।
তিন মিনিট।
চার মিনিট।
পাঁচ মিনিট।
হঠাৎ মিরাজ লাফ দিয়ে উঠলেন। বিশাল লাফ। তার বিশাল ভুঁড়ি নিয়েও কিভাবে তিনি এত সুন্দর লাফ দিলেন বলা মুশকিল।
বলা বাহুল্য, আয়নার ওপাশের মিরাজও সেইরকম একটা লাফ দিলেন।

দুই ঘণ্টা শেষ হবার ঠিক দুই মিনিট আগে ইবা বিরকু মিরাজের কামরায় হাজির হল। কি ব্যাপার ? হইসে ?
মিরাজ বললেন, আবার জিগায়।
ইবা বিরকু বলল, বল তাড়াতাড়ি।
মিরাজ বলল, আগে কথা দাও আমারে ছাইড়া দিবা।
দিব।
আগের জায়গায় পৌঁছায়া দিয়ে আসবা ?
আসব।
তাইলে শোন...এই বলে মিরাজ ইবা বিরকুর কানে কানে কিছু একটা বললেন। ইবা বিরকু প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে শুনল, তারপরই তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। শিশুর মত লাফিয়ে উঠল সে। হইসে! হইসে!! আসো মিরাজ, তুমারে চুম্মা দিই!!!
মিরাজ কোন মতে তার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। ও দিবে চুম্মা ? তাইলেই হইসে।
নাহ, এই যাত্রা বাঁচা গেছে। নো মোর টেনশন। জাস্ট হ্যাপিনেস।

হঠাৎ করেই মিরাজ আবিষ্কার করলেন, তার আর পাতলা পায়খানার বেগ আসছে না। সুতরাং, এখন বাম হাতটা ধুয়ে ফেলা যেতে পারে।

****

পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত।
ইবা বিরকুর গার্লফ্রেন্ডের বাবাকে ধাঁধাঁর সঠিক জবাব দেবার পর সে উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, এই তো আমার কুটু কুটু সোনামণি! আমার মেয়ে তোমারই, যাও নিয়ে যাও!
ইবা বিরকুর গার্লফ্রেন্ড ইবা বিরকুর কাছে চলে আসে। দুজনে মিলে মিরাজকে সি অফ করতে আসে পৃথিবীতে।
ইবা বিরকু আরেকটু হলে বলেই ফেলত, জানু জানো, ঐ মোটা করে কালোমত লোকটাই না তোমার দুষ্টু আব্বুর ধাঁধাঁর সমাধানটা বলে দিয়েছে...
কিন্তু মিরাজ মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলেন। বলা যায়না, দেখা গেল আসল কাহিনী জানলে মেয়েটা মিরাজের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
তিনি বললেন, মা, তোমার বয়ফ্রেন্ড অতি প্রতিভাবান। সে ধাঁধাঁর সমাধান আগেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু একটু সাসপেন্স করার জন্য বলেছে একদম শেষে।
এই কথা শুনে আহ্লাদে গলে গিয়ে ইবা বিরকুর গার্লফ্রেন্ড শুঁড় নাড়িয়ে বলেছে, যাহ্, দুষ্টু! তারপরই সে ইবা বিরকুর প্রশস্ত বুকে শুঁড় লুকিয়েছে।
রোম্যান্টিক দৃশ্যটা দেখে বুকের মধ্যে খচ করে উঠল মিরাজের। তার জীবনেও রোমান্স ছিল...কিন্তু...তার বউ...এক সতের বছরের যুবকের হাত ধরে...নাহ, আর ভাবতে চান না তিনি। এখন যেমন আছেন, সে-ই ভালো।

মিরাজকে সেই রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল মহাকাশযানটা। মিরাজ আকাশের দিকে কিছুক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন তিনি।

শালা ঐ ইবা বিরকুর মত মাথামোটাও ভালোবাসা পেয়েছে, আর তিনি সারা জীবন খালি গুপ্তকেশই ছিঁড়েছেন। ধুর শালা !

পরিশিষ্ট ১:

প্রফেসর মিরাজ যখন আমাকে এই গল্পটি বলা শেষ করলেন, তখন আমি বললাম, স্যার, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি ধাঁধাঁর যে সমাধানটা দিয়েছিলেন সেটা কি ?
মিরাজ আমার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, কেন, ডিএমসির কোন বান্ধবী বলেছে নাকি যে ***"সাল্লু, এই ধাঁধাঁটা সমাধান করে দিলে আমি তোমার, শুধু তোমার"*** ?
আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। প্রফেসর এই বুড়ো বয়সেও এত রসিক! আমি বললাম, না স্যার, কিন্তু পাঠকরা তো মানবে না। তারা তো উত্তর চাইবে।
প্রফেসর বললেন, কেন, তারা তো নিজেরাই ভেবে বের করতে পারে, পারে না ?
আমি বললাম, অবশ্যই পারে।
প্রফেসর বললেন, তবে এটা তাদেরই করতে দাও ! এই বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি অবশ্য পরে প্রফেসরের মুখ দিয়েই উত্তরটা বের করেছিলাম। উত্তরটা হল-

"কেউ যদি তোমাকে যদি প্রশ্ন করত যে 'তুমি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী ?' তাহলে তুমি কি উত্তর দিতে?"

এটার ব্যাখ্যাও প্রফেসর দিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে, লোকটা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে অন্য কারও প্রশ্নের উত্তরে সে উত্তর দিত "সত্যবাদী।" এবং তোমার কাছেও সে সত্য বলছে বিধায় সে তোমাকে বলত "সত্যবাদী।"

আর লোকটা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে অন্য কারও প্রশ্নের উত্তরে সে উত্তর দিত "সত্যবাদী।" কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যা বলছে বিধায় সে তোমাকে বলত "মিথ্যাবাদী।"

তাহলে দেখ, দু ক্ষেত্রেই, তোমাকে লোকটা যে উত্তর দিচ্ছে, সেটাই তার আসল পরিচয়। এই দেখ, তোমাদের বোঝাতে গিয়ে নিজেই কেমন কনফিউশনে পড়ে গেলাম!! সামবডি হেল্প, প্লিজ!!

পরিশিষ্ট ২:

এই প্রশ্নটি যখন আমি বহৎ মাঞ্জা মেরে আমার রুমমেট কবির ভাইকে করলাম, উনি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, প্রশ্নটা হচ্ছে, এক আঙ্গুল তুলে তার সামনে ধরে বলতে হবে "এখানে কয়টা আঙ্গুল তোলা হয়েছে?"

লোকটা যদি সত্যবাদী হয় তো বলবে এক আঙ্গুল। আর মিথ্যাবাদী হলে বলবে অন্যকিছু। সহজ সমাধান।

টাসকি খেয়ে গেলাম। আসলেই, এত সহজভাবে তো আর চিন্তা করি নি !

প্রফেসর মিরাজ ও তার 'ফিউচার টেলার টাইম মেশিন'-তত্ত্ব

সপ্তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে অতিথি হয়ে এসেছেন প্রফেসর মিরাজ। তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ। কারণ তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি "ফিউচার টেলার টাইম মেশিন"এর প্রথম সূত্র "আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত" এর প্রমাণ দিয়েছেন। যখন প্রশ্ন উঠেছিল যে "টাইম মেশিনে ভবিষ্যৎ দেখানো সম্ভব হলেও সেটাই যে সত্য তার প্রমাণ কি? ভবিষ্যৎ কি পূর্বনির্ধারিত?", তখন এই প্রথম সূত্রের অবতারণা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত এবং সেটাই টাইম মেশিন দেখাবে, যদি আবিষ্কার হয়। সুতরাং এই প্রথম সূত্রটি প্রমাণ করতে না পারলে টাইম মেশিন বানানোর কোন বেস থাকে না। প্রথম সূত্রটি প্রমাণ করতে না পারলে টাইম মেশিন যে ভবিষ্যৎ দেখাবে তা সাধারণ মানুষ মানবে কেন ?

একের পর এক বক্তা মঞ্চে উঠছেন আর বক্তব্য দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। সাধারণ জনতা হাঁসফাঁস করছে। তারা যে এইসব বুড়োর কচকচানি শোনার জন্য আসে নি, এসেছে শুধুমাত্র প্রফেসর মিরাজকে একনজর দেখার জন্য, তার বক্তব্য শোনার জন্য।

অবশেষে মঞ্চে উঠলেন মিরাজ। জনতা প্রবল করতালিতে তাকে সম্ভাষণ জানাল।

মিরাজ গলা খাঁকড়িয়ে বললেন, "সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাকে যে আপনারা এত বড় একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তার জন্য আমি যারপরনাই আনন্দিত। আমি জানি, আপনারা সবাই জানতে চান কিভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত হল। আরও জানতে চান টাইম মেশিন সম্বন্ধে।"

"এই যে, আপনি," সামনের সারিতে বসা একজনকে দেখিয়ে বললেন মিরাজ, "আপনি একটু উঠে আসুন তো।"

লোকটি উঠে এল। মিরাজ পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে তার পেটে গুলি করলেন। সে চিৎকার করে পড়ে গেল।

সাথে সাথে সারা মিলনায়তনে ছড়িয়ে পড়ল কোলাহল। উপস্থিত জনতা চিৎকার চেচামেচি করতে লাগলো। একটু পরেই পুলিশ এসে ধরে ফেলল মিরাজকে। তাকে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হল। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হল।

গুলিটা করার ত্রিশ সেকেন্ড পরে মিরাজ বললেন, "আমাকে নিয়ে যাবার আগে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করতে চাই।"

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান সংস্থার সর্বাধিনায়ক হাগামোতো প্রিশি। তিনি আবার মিরাজকে খুবই সম্মান করেন। তিনি বললেন, "উনাকে বলতে দাও।"

মিরাজ হাসিমুখে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "এই যে দেখুন, আমি ওকে গুলি করলাম। তাতে কি হল? অনেক কিছু হল। প্রথমত গুলিটা বের হয়ে ওর গায়ে লাগল। ও পেটে আঘাত পেল। আর্তনাদ করে পড়ে গেল রিফ্লেক্স অ্যাকশন হিসেবে। রাইট ?"

"তারপর আপনারা ক্ষেপে গেলেন। চেচামেচি শুরু করলেন। আমাকে মারতে চলে এলেন কেউ কেউ। পুলিশ আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল, রাইট ?"

"এই পুরো ঘটনাটুকু হয়েছে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে। অর্থাৎ, ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমার গুলি করা থেকে শুরু করে অনেক গুলো কাজ এই মিলনায়তনে সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি পাঁচ ছয়টাকে।"

"সেই পাঁচ ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফ্লো চার্ট আকারে দেখালে হয়...

সময়কালঃ ৩০ সেকেন্ডঘটনাপ্রবাহঃ গুলি - পড়ে যাওয়া - দর্শকদের অবলোকন - চিৎকার চেচামেচি - পুলিশ দৌড়ে আসা - আমাকে গ্রেফতার

এখন দেখুন তো, প্রথমে যদি আমি গুলিটা না করতাম, তাহলে কি পরের ঘটনাগুলো হত ? না, হত না। দ্বিতীয়ত, গুলি খেয়ে ও যদি পড়ে না যেত তাহলে কি পরের ঘটনাগুলো ঘটত ? সহজ জবাব, ঘটত না। একইভাবে, দর্শকরা ওর পড়ে যাওয়া না দেখলে চিৎকারও করত না, পরের ঘটনাগুলোও ঘটত না।

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে একটি কার্যকারণ আছে। একটা Cause বা Reason আছে।

ঠিক একইভাবে হিসাব করলে, প্রত্যেকটি ঘটনার এক বা একাধিক ফলাফল আছে। এখানে যেমন গুলি করা একটি ঘটনা, কিন্তু তার ফলাফল কিন্তু পরের সবগুলোই। আবার পড়ে যাওয়া একটা ঘটনা, এর ফলাফল কিন্তু তারপরের সবগুলোই। অর্থাৎ, প্রতিটি Cause এর এক বা একাধিক Effect আছে।

এবার আমরা লক্ষ্য করি, একটা Cause এর অনেকগুলি Effect থাকতে পারে, যদি Time Interval বেশি হয়। Time Interval যত বেশি হবে, Effect বা ফলাফল তত বেশি হবে। Time Interval যত কম হবে, Effect বা ফলাফল তত কম হবে।

যেমন আমরা সময় ব্যবধান ত্রিশ সেকেন্ড নিয়েছি বলে গুলি করার Effect হয়েছে ৫ টা। এখন দেখুন, ও পড়ে গিয়েছে তিন সেকেন্ডের মাথায়, সব দর্শক দেখে ঘটনা বুঝতে পেরেছে দশ সেকেন্ডের মাথায়, চিৎকার চেচামেচি পুলিশকে সজাগ করেছে সতের সেকেন্ডের মাথায়, পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করেছে ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায়।

আপনি Time Interval বিশ সেকেন্ড নিলে Effect পেতেন পাঁচটা নয়, চারটা। Time Interval দশ সেকেন্ড নিলে Effect পেতেন দুইটা। তিন সেকেন্ড নিলে Effect পেতেন ১ টা।
এখন Time Interval এক সেকেন্ড নিলে ? তখন কি কোন Effect পাওয়া যেত না ?

অবশ্যই যেত। আমরা এতক্ষণ যে Effect গুলো আলোচনা করলাম সেগুলো ছিল আমাদের সুবিধার্থে আলাদা করা কিছু Major Effect । কিন্তু অনেক ছোট ছোট Effect ও তো আছে। গুলি করার পর প্রথম এক সেকেন্ডের কথা চিন্তা করি। গুলিটি বের হল, বাতাসে বেশ কিছুটা সময় অতিক্রম করল, ওর জামা স্পর্শ করল, জামার উপর দিয়ে চামড়া স্পর্শ করল, জামা ভেদ করল, চামড়া ভেদ করল, শরীরে ঢুকে গেল ইত্যাদি।

এই প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটার জন্য কিছু কিছু সময় লেগেছে। ধরি, বুলেটটা বাতাসে থাকল x মাইক্রোসেকেন্ড। সুতরাং, Time Interval x নিলে, Effect হত একটাই। সেই Effect টা হত বুলেটটা বাতাসে থাকা। আর Time Interval x এর বেশি নিলে, Effect হত একাধিক।

এইভাবে Time Interval কমাতে কমাতে আমরা এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ে নিয়ে আসতে পারি, যাতে Effect কোনমতেই এক এর বেশি হবে না। আর সেই Effect কে ভাঙ্গা যাবে না। যেমন, বাতাসে গুলির অবস্থানকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। অতিক্রান্ত দূরত্বকে দশ ভাগ করে একটা Effect কে দশটা ধারাবাহিক Effect হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু আমরা এমন একটা সময়ে যাব যেখানে একটাই ঘটনা ঘটা সম্ভব এবং সেটা কোনভাবে কয়েকভাগে ভাগ করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

কত সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময় ? সেটা হতে পারে এক সেকেন্ডের হাজার হাজার কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ। বা আরও ছোট কিছু। আর কি হতে পারে সেই Effect ? সেটা হতে পারে Electron এর ১ টা ঘূর্ণন, বা এর চেয়েও ছোট কিছু। এমন কিছু, যাকে কোনভাবে কয়েকভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়। আর সম্ভব হলেও ভবিষ্যতের কোন পরিবর্তন হবে না।

সহজ কথায়, **When Time Interval tends to One cause gives rise to one and only one effect.**
তার মানে, একটা ঘটনা ---> একটা ফলাফল।
আবার, সেই ফলাফল নিজেই একটি ঘটনা!
তাই, একটা ঘটনা ---> একটা ঘটনা ---> একটা ঘটনা ---> একটা ঘটনা... এভাবে চলতেই থাকবে।
অর্থাৎ, একটা ঘটনা থেকে শুধু একটাই ধারাবাহিক ভবিষ্যৎ পাওয়া সম্ভব।

এখন, কোন সুপার সুপার কম্পিউটারকে যদি বিশ্বজগতের সব ডাটা এনে দেয়া হয়, তাহলে সে বিশ্লেষণ করে বের করে দিতে পারবে যে সারা বিশ্বজগতের বর্তমান অবস্থা যদি ঘটনা হয়, তাহলে সময় ব্যবধান শূন্যের কাছাকাছি হলে পরের ঘটনা কি। একই ভাবে তার পরের ঘটনা কি। তার পরের ঘটনা কি। সহজ ভাষায় ভবিষ্যৎ কি।

কিন্তু এত ডাটা জোগাড় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। এত তুখোড় বিশ্লেষণশক্তি সম্পন্ন কম্পিউটারও বানানো সম্ভব না। সুতরাং, "ফিউচার টেলার টাইম মেশিন" বানানো আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।"

অবশেষে থামলেন প্রফেসর মিরাজ। করতালি নয়, গালাগালিতে ভেসে যাচ্ছে সারা মিলনায়তন। "ঐ প্রফেসর বুইড়া ধর, সকাল বিকাল নাস্তা কর" - ধ্বনিতে সরব হয়েছে পুরো অডিটোরিয়াম। ঠিক তখনই মিরাজ ঐ গুলি খাওয়া লোকটাকে বললেন, "সালেহ, ওঠ।"

লোকটা সহজভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একটা মুচকি হাসি দিল। উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। মিরাজ বললেন, পিস্তলে কোন বুলেট ছিল না। ধন্যবাদ।

প্রফেসর মিরাজ ও খবিশ চৌধুরী

১

সি আই এ হেডকোয়ার্টার
গুলিস্তান
বাংলাদেশ
সকাল ১১.৪৭

চিন্তিত মুখে নিজের চেয়ারে বসে আছেন সি আই এ চিফ রাহাত খান। তার মেজাজ মোটেও ভালো নেই। একটু পর পরই তিনি দাঁত কিড়মিড় করে কাকে যেন বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছেন। আর একটু পর পর নিজের চুল ধরে টানাটানি করছেন। এতে করে তার মাথায় মসৃণ টাকের চারপাশে যে সামান্য কটি চুল অবশিষ্ট আছে সেগুলিও বিলুপ্তির হুমকিতে পতিত হচ্ছে।

রাহাত খানের সামনে যে মানুষটা দুই হাত গুপ্তাঙ্গের সামনে দিয়ে লজ্জায় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম জেমস বন্ড। হ্যাঁ, সেই দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ এজেন্ট জেমস বন্ড এখন বাংলাদেশ সি আই এর অফিসার।

রাহাত খান বললেন, "জেমস !"
বন্ড বলল, "যাহ ! দুষ্ট ু!"
"কে দুষ্টু ?" চেঁচিয়ে উঠলেন রাহাত খান।
"অ্যা-ই তুমি আমার সাথে এত দুষ্টুমি করে কথা বল কেন ? আমার কিন্তু লজ্জা লাগে !" লজ্জায় কুকড়ে গেল বন্ড।
রাগে অন্ধ হয়ে চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন রাহাত খান। খপ করে ধরতে গেলেন জেমস বন্ডের হাত। বন্ড লাফ দিয়ে সরে গিয়ে বলল, "না না বিয়ের আগে না, বিয়ের আগে না!
"হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন রাহাত খান। কি হয়েছে বন্ডের ? সে এরকম ব্যবহার করছে কেন ? কি করেছে তাকে খবিশ চৌধুরী ?"

খবিশ চৌধুরী ! নামটা মনে আসতেই আবার মা বাপ তুলে কিড়মিড় করে গালাগালি শুরু করলেন রাহাত খান।

২

দশ দিন আগের ঘটনা।

কুখ্যাত বিজ্ঞানী খবিশ চৌধুরীকে ধরার জন্য সি আই এ থেকে জেমস বন্ডকে একটা গোপন অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়। দায়িত্ব নিয়ে বন্ড যাত্রা শুরু করে খবিশ চৌধুরীর ডেরার উদ্দেশ্যে। প্লেন থেকে প্যারাট্রুপিং করে নেমে A K - 47 দিয়ে পাঁচশ, ছুরি দিয়ে দুইশ, ঘুষি আর লাথি মেরে দেড়শ, বুলেটের খোসা দিয়ে একশ আর ফুঁ দিয়ে গোটা পনের শত্রুকে খতম করে খবিশ চৌধুরীর বেডরুমে ঢুকে পড়ে বন্ড। গিয়ে দেখে, বিছানায় শুয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী।

লুল বন্ড ভুলে যায় অ্যাসাইনমেন্টের কথা। সে হাঁটু গেঁড়ে সুন্দরীর সামনে বসে গদগদ কণ্ঠে বলে, "ওয়ানা বি মাই বন্ড গার্ল ?"
সুন্দরী বলে, "কিন্তু তুমি তো একটা লুলা। একটা বন্ড গার্লকেও তুমি ধরিয়া রাখিতে পারো নাই। সবাই ভাগিয়াছে। তোমার এনার্জি লইয়া আমার সন্দেহ জাগিতেছে।"
বন্ড বলল, "আরে নাহ ! তুমি মনে হয় বন্ড সিনেমাগুলো পুরোটা দেখো নাই, বিশেষ জায়গাগুলো কাটিয়া কাটিয়া দেখিয়াছ। সেইজন্য বুঝিতে পারিতেছ না।"
সুন্দরী বলল, "নাহ। তোমাকে বিশ্বাস নাই। তবে একটাই উপায় আছে। তুমি যদি এই বিশেষ ক্যাপসুলটা খাইয়া লও তবে তোমার শরীরে হাতির শক্তি আসিবে। তখন দশ বিশ মিনিট নয়, পুরো সিনেমাতেই তুমি ঐ কাটাকাটির দৃশ্য রাখিতে পারিবে-' বলে সুন্দরী তার সাপের চামড়ার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা লাল ক্যাপসুল বের করে দিল।

বন্ড ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাপসুলটা সুন্দরীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গপাৎ করে গিলে ফেলল। তারপর ঢোক ঢোক করে পানি খেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সুন্দরীর দিকে। কিন্তু একটু পরেই তার মাথা ঘুরতে লাগল, বমি পেতে লাগল প্রবলভাবে।

বন্ড বলল, "তুমি আমাকে কি খাইতে দিয়াছ, সুন্দরী ?"
সুন্দরীর মুখোশ খুলে খবিশ চৌধুরী বলল, "ঘুমের ওষুধ দিয়াছি, কুত্তার বাচ্চা ! অনেক দিন ধরিয়াই তোমাকে ধরার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইতেছিলাম না। আজ তোমাকে পাইয়াছি। আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই। হা হা হা হা। ওরে হো হো হো হো।"
"না-আ-আ-আ-আ", তারপর আর জেমসের কিছু মনে নেই।

৩

রাহাত খানের ল্যাপিতে সবসময় ফেসবুকে লগ ইন করাই থাকে। কারণ বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সময় ঘুমায়। তাই বিভিন্ন দেশের মানুষ ফেসবুকও ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে। বলা তো যায় না, কখন কোন সুন্দরী অনলাইনে থাকে।

জেমসের অবস্থা দেখে খারাপ হওয়া মেজাজটা ভালো করার জন্য ফেসবুকে ঢুকলেন রাহাত খান। ইনবক্সটা ওপেন করেই মনটা ভালো হয়ে গেল তার। ঐতিন্দ্রিলা অহনা নামে যে ভারতীয় মেয়েটা এতদিন ধরে তার সাথে ফেসবুকে চ্যাট করে এসেছে সে যেন কি একটা পাঠিয়েছে। সাথে সাথে মেসেজ ওপেন করলেন তিনি।

হায় হায়, এসব কি লেখা ? রাহাত খান মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার আর মেয়েটির চ্যাট লিস্ট ছিল অনেকটা এরকম...

২০/০১/২০১২

হাই অহনা! কি সুইট নেইম!
তাই?
কি কর তুমি?
পড়াশোনা। তুমি?
আমি ?
আমি কি জানো ? গেস কর তো!
কি আবা র? হবা কিছু একটা।
এই শোনো, কাউকে বোলো না কিন্তু, আমি সি আই এ চিফ রাহাত খান।
সত্যি ?
হ্যাঁ। ইম্প্রেসড ?
নট ইয়েট। বাই।

২১/০১/২০১২

হাই।
হুম।
আমি যে সি আই এ চিফ বিশ্বাস হয় না?
না।

কেন ?

বিশ্বাস হবেই বা কেন?

আচ্ছা, কি বললে তুমি বিশ্বাস করবে?

সি আই এ হলে তো তোমাদের অনেক অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। তা দুই একটা মিশন সম্বন্ধে বল, দেখি বিশ্বাস করা যায় নাকি।

না না, আমার চাকরি চলে যাবে।

থাকো তুমি তোমার চাকরি নিয়ে, লায়ার!

আরে শোন শোন...

২৬/০১/২০১২

হাই।

কি ?

আমাদের মিশন সম্বন্ধে শুনবা ?

বলবা ? ধুর, তুমি তো বানায়া বানায়া বলবা।

আরে নাহ। বলি ?

বল।

এক বছর আগে চাঙ্খারপুলের কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোমেজকে আমরাই আটক করেছিলাম। কয়েক মাস আগে আলীম হলের "টয়লেটে ভুত" রহস্য আমরাই সমাধান করেছিলাম মাত্র পনের দিনে।

ধুর, এগুলা তো সবাই জানে।

তাহলে শোন, কাউকে বলবা না কিন্তু।

কেন বলব?

খবিশ চৌধুরীকে চেন ?

না। কে সে ?

কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও বিজ্ঞানী। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা একটা মিশন সেট করছি।

তাই নাকি ? তা কে যাচ্ছে মিশনে ?

তুমি বিশ্বাস করবা না, এই মিশনে যাচ্ছে জেমস বন্ড !

জেমস বন্ড! ও মাই সুইটহার্ট!! ও তো আমার হিরো!!! আচ্ছা, ও কিভাবে খবিশকে ধরবে ?

হু হু, আগে বল আমাকে তুমি বিশ্বাস করতেসো ?

করতেসি তো জান ! বল না প্লিজ।

বললে কি দিব া?

কি দিব ? ছি ছি তুমি কি দুষ্টু !

তাই ? কি দিবা আগে বল।

তুমি কি চাও ?

তোমার ফোন নম্বর।

আচ্ছা ঠিক আছে। দিব। আগে বল জেমস কিভাবে খবিশকে ধরব ে?
তাহলে শোন, ...

০৭/০২/২০১২ (আজকের তারিখ)

হেই রাহাত বুড়ো !
তোমার দেয়া ইনফরমেশন দিয়ে আমি জেমস বন্ডকে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হয়েছি। ওর ধারণা ও আমার অনেকগুলো লোককে গুলি করে তারপর আমার বেডরুমে ঢুকেছিল। কিন্তু আসলে আমার পক্ষের কেউই মারা যায় নি, ওগুলো ছিল হলোগ্রাফিক ইমেজ। আমি তো জানতামই সে কখন কোন পথ দিয়ে আসবে, কি অস্ত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে, কারণ সেগুলো তো তুমিই আমাকে বলেছ! হা হা হা হা ! জেমসকে আমি প্রথমে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করি। তারপর ওর ব্রেনে আমি সামান্য একটু সার্জারি করি। এতে কি হয় জানো ? ও বাইরে পুরুষ থাকলেও ভিতরে ভিতরে মেয়ে হয়ে যায় ! আর এখন ও তোমাকে ওর প্রেমিক ভাবছে নিশ্চয়ই !!
মেয়েটাকে নিয়ে সুখে থেকো, বুড়ো।
ইতি,
“ঐতিন্দ্রিলা অহনা” ফেইক আই ডির মালিক,
খবিশ চৌধুরী (খবস)।

রাহাত খান মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়েন। জেমস বন্ড তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠিক তখনই ইলোরা একটা ফাইল হাতে রাহাতের রুমে ঢোকে।

রাহাত খান বলেন, এইটা কি?
ইলোরা বলে, খবিশ চৌধুরীকে জেমস বন্ড বা মাসুদ রানা নয়, শার্লক হোমস বা ফেলুদাও নয়, ধরতে পারবে একজনই। এই যে তার প্রোফাইল।

রাহাত খান অনেকক্ষণ ধরে শূন্য দৃষ্টিতে ফাইলটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওখানে একজন কালো, মোটা মানুষের ছবি দেয়া আছে। তার কোন আর্মি ট্রেনিং নেই, নেই কোন মেডেল। সি আই এ বা সিক্রেট সার্ভিসের হয়েও কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা নেই তার। তার নামের আগে শুধু একটা বিশেষণ আছে, প্রফেসর।

প্রফেসর মিরাজের ফাইলটার দিকে অনেকক্ষণ হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রাহাত খান।

৪

প্রফেসর মিরাজ সিগারেট টানার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিতে ফিল্টারের দিক থেকে নয়, সিগারেট টানা হয় উল্টো দিক থেকে। সিগারেট টানা এমনিতেই একটা ভাবের কাজ, আর এই পদ্ধতিতে ভাবটা বেশি মারা যায়।

তো একদিন প্রফেসর মিরাজ নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে সোফায় বসে সিগারেট টানছিলেন, এমন সময় সেখানে হাজির হলেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান হাগামোতো প্রিশি। প্রিশি এই নতুন স্টাইলে সিগারেট টানা দেখে বললেন, বস, এইভাবে টাইনা কি লাভ ?
মিরাজ বললেন, আরে ব্যাটা, ভাবের তুই কি বুঝোস ? তুই তো বাচ্চা, তোর তো কোন "ইশটাইল" নাই।
প্রিশি বললেন, হায় হায়, আপনার ইংরেজি উচ্চারণের এ কি অবনতি ! আপনি কি রিসেন্টলি এম এ জলিল অনন্তর "স্পিড দ্য গতি" মুভিটি দেখেছেন ?
মিরাজ বললেন, দেখি নাই মানে ? অবশ্যই দেখসি। নায়িকা তিনটা সেইরকম সুন্দরী।
প্রিশি অবাক হয়ে বললেন, তিনটা মানে ? নায়িকা তো দুইটা।
মিরাজ মাছি মারার মত একটা ভঙ্গি করে বললেন, আরে ধ্যাত ! শিওর তিনটা। ক্যান, এ জি আই গ্রুপের মালিক একটা আর মালয়েশিয়ান দুইটা। হইসে ?
প্রিশির মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি কি আসলেই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী প্রফেসর মিরাজের সাথে কথা বলছেন ?
প্রিশি কথা ঘুরানোর জন্য বললেন, বস, আপ্নে যে এইভাবে ফিল্টার ছাড়া সিগারেট খান, আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না ?
মিরাজ বললেন, না, মোটেও না।
প্রিশি অবাক হয়ে বললেন, ক্যামনে ? ঐ যে সব জায়গায় লেখা থাকে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ইত্যাদি ইত্যাদি, ঐগুলা কি সব ভুয়া ?
মিরাজ বললেন, ধ্যাত, ভুয়া হবে ক্যান ?
প্রিশি বললেন, তাইলে ?
মিরাজ বললেন, আরে গাধা! স্বাস্থ্যের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে তো আমি সিগারেটটায় আগুনই দেই নাই। "ইশটুপিড"!

গালি খেয়ে চুপসে গেলেন প্রিশি। তখনই তার মনে পড়ল প্রফেসর মিরাজের কাছে তার আগমনের আসল উদ্দেশ্য।

প্রিশি বললেন, বস, একটা ঝামেলা হইসে। খবিশ চৌধুরী নামে এক শালার পো নিজেকে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী বলে দাবী করতেসে।
মিরাজ তুড়ি মেরে বললেন, তা আমি কি করব ?

প্রিশি বললেন, আপনারেই তো সব করতে হবে। ঐ ব্যাটা কঠোরভাবে নারীবিদ্বেষী, তার টার্গেট হচ্ছে পৃথিবী থেকে নারীজাতিকে বিলুপ্ত করে সারা পৃথিবীতে "পুরুষ সাম্রাজ্য" কায়েম করা। সেইজন্যে সে অলরেডি কাজ শুরু করে দিসে। তার সাগরেদরা সাধারণ ওষুধের মধ্যে ভয়ঙ্কর সব উপাদান ভেজাল হিসেবে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
তাতে কি হচ্ছে ?
যে মেয়েই ঐ ওষুধ খাচ্ছে সেই মেয়েই আস্তে আস্তে ছেলে হয়ে যাচ্ছে। যার শরীরে যত বেশি ওষুধ ঢুকছে সে তত তাড়াতাড়ি আর তত বেশি পুরুষ হয়ে যাচ্ছে।
মিরাজকে এবার একটু আগ্রহী দেখা গেল। উনি মুখ থেকে লালাসিক্ত সিগারেটটা নামিয়ে বললেন, মানে ? একটু বুঝায়া বল তো।
প্রিশি বললেন, মানে ধরেন এক মেয়ে ঐ ওষুধ খাইল। সাথে সাথে তার মাথা চক্কর দেয়া শুরু হয়ে যাবে। একটু পরেই শরীরে নানারকম অ্যাকশন রিঅ্যাকশন হবে। আস্তে আস্তে তার বুক সমান হয়ে আসবে, মেয়েলি অঙ্গগুলো রূপান্তরিত হবে পুরুষ অঙ্গে। ব্যস, সে আস্তে আস্তে পুরুষ হয়ে যাবে। ওষুধের ডোজের উপর নির্ভর করবে পুরুষের বৈশিষ্ট্য সে কতটা পাবে।
তাই ?
হু। মেয়েদের আজ বড় বিপদ, মিরাজ ভাই। এখন একমাত্র আপ্নেই পারেন তাদের উদ্ধার করতে, তাদের বাঁচাতে।
ক্যান ? আর লোক নাই ? ক্রিমিনাল ধরা কি আমার কাম ?
ঐ শয়তান খবিশ চৌধুরীকে ধরার জন্য এর আগে অনেকগুলা এজেন্টকে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বশেষ ছিল জেমস বন্ড। কিন্তু জেমস বন্ডও শেষ পর্যন্ত ওর বুদ্ধির কাছে ফেল মেরে গেছে।

জেমস বন্ড ! নামটা শুনেই নড়েচড়ে বসলেন মিরাজ। কৈশোর আর যৌবনের বিশেষ অংশ তো তার জেমস বন্ডের সিনেমা দেখেই কেটেছে। সেইসব দৃশ্য কি আর চাইলেই ভোলা যায় ?

জেমস বন্ড পর্যন্ত ধরা খেয়ে গেল ? তাহলে আমি চুটকে প্রফেসর হয়ে ওর কি করতে পারব ?
এটা বললে তো হবে না বস। সেও বিজ্ঞানী, আপনিও বিজ্ঞানী। তাকে ধরতে গেলে তার সায়েন্টিফিক ট্রিকগুলোকে টেক্কা দিতে হবে, যেটার জন্য লাগবে একজন বুদ্ধিমান বিজ্ঞানিকে। আর সেজন্যে আপনিই পারফেক্ট।
আচ্ছা, তো আমাকে ঠিক কি করতে হবে ?
তাহলে শুনুন, আপনাকে খবিশ চৌধুরীকে জ্যান্ত ধরে এনে দিতে হবে। আর তার ঐ ওষুধ তৈরির ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে দিতে হবে। এ কাজে আপনি যত ইচ্ছা অস্ত্র বা সৈন্য সাথে নিতে পারেন। কিন্তু সফল আপনাকে হতেই হবে।
মিরাজের স্বভাবই হচ্ছে যত অসম্ভব কাজই হোক তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। মিরাজ বললেন, ধরে নাও তোমার কাজ শেষ। কিন্তু বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি ?
কি পাচ্ছেন ? টাইম মেশিন বানানোর জন্য আপনাকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা করতে রাজি আছে সরকার।
তাই ? আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলেন মিরাজ, আমি রাজি !

ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ বস। আপনিই পারবেন খবিশ চৌধুরীকে ধরে আনতে। উইশ ইউ গুড লাক। চলে গেলেন প্রিশি।

মিরাজের মুখে আবার সিগারেটটা ফিরে গেল। ও আচ্ছা, এই পদ্ধতিতে সিগারেট টানার আরেকটা সুবিধা ঐ গাধা প্রিশিটাকে বলা হয় নি। এতে এক সিগারেটেই এক সপ্তাহ কাটানো যায়। প্রফেসর মিরাজের আবিষ্কার বলে কথা, হু।

৫

সি আই এ হেডকোয়ার্টার
গুলিস্তান
ঢাকা
বাংলাদেশ

রাহাত খানের অফিসে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন প্রফেসর মিরাজ। তার এই এক স্বভাব, পায়ের উপর পা না তুলে তিনি কিছুতেই বসতে পারেন না। তার সামনে ভ্রূ কুঁচকে বসে আছেন সি আই এ প্রধান রাহাত খান। তার মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

রাহাত খান বললেন, তাহলে আপনি বলছেন আপনি একাই যাবেন ঐ খবিশ চৌধুরীকে ধরতে?
মিরাজ উত্তর দিলেন, হু। এইটা কোন ব্যাপার ?
রাহাত খান বললেন, আপনাকে কিন্তু আগেও বলা হয়েছে আপনার আগে অনেক বাঘা বাঘা এজেন্ট ওকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কিন্তু অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে গিয়েও ওর গুপ্তকেশও ছিঁড়তে পারে নি। অথচ আপনি বলছেন একা যাবেন।
মিরাজ বললেন, ধুর ধুর ঐ ব্যাটাকে ধরতে তো একটা গাধাকে পাঠালেও সে সফল হবে। আমি নিজে যাচ্ছি শুধু কাজটা শিওর করার জন্য।
রাহাত খানের চোখ মাথায় উঠে গেল। বলে কি ব্যাটা?
তিনি বললেন, তাহলে আপনি কবে যেতে চাচ্ছে ন?
মিরাজ বললেন, আজই। এখনই।
এখনই ?
হুম। কোথায় থাকে সে ?

রাহাত খান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা ম্যাপ বের করে প্রফেসর মিরাজকে নির্দেশনা দেয়া শুরু করলেন।

৬

খবিশ চৌধুরীর আস্তানা।

খবিশ চৌধুরীর মনে আজ বড় প্রশান্তি। কয়েকদিন আগেই ফাঁদে ফেলে সি আই এর সবচেয়ে বড় এজেন্ট জেমস বন্ডকে কব্জা করে মেয়ে বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, জেমস বন্ড ছিল তাদের সবচেয়ে ভালো এজেন্ট। এই লোক ফেল মারলে আর কাউকে পাঠানোর সাহস সি আই এর হবে না।

তার মানে, এখন তিনি সেফ। মুক্ত। স্বাধীন। কেউ আর তাকে বাঁধা দিতে পারবে না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। জগত থেকে নারী বিলুপ্ত করে "পুরুষ সাম্রাজ্য" স্থাপন করতে কেউ আর তাকে বাঁধা দিতে পারবে না।

হঠাৎ কমলা সুন্দরীর কথা মনে পড়ে যায় খবিশ চৌধুরীর। কমলা সুন্দরী ছিল খবিশ চৌধুরীর ক্লাসমেট। খবিশ তাকে নিয়ে অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল। কিন্তু নেহায়েত একটু কালো, বেঁটে আর বাপের টাকা কম ছিল বিধায় খবিশকে চড় মেরে বয়ফ্রেন্ডের মার্সিডিজে করে চলে গিয়েছিল কমলা। সেই থেকে প্রতিশোধস্পৃহায় দাউ দাউ করে জ্বলেছেন খবিশ চৌধুরী। অপেক্ষা করেছেন কবে পৃথিবীর সকল নারীর উপর প্রতিশোধ নেয়া যায়। আজ সে সুযোগ এসেছে। হ্যাঁ, আজ তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব নারীকে পুরুষ বানিয়ে দিতে পারেন।

নেংটু হয়ে বাথরুমে পা ঝুলিয়ে বসে এইসব চিন্তা করছিলেন খবিশ, এমন সময় খানসামা এসে বলল, সবাই অপেক্ষা করছে হুজুর।
খবিশ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন। তার মনেই ছিল না যে আজকে তিনি তার সব অনুসারী কর্মচারীদের নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করেছেন।
খবিশ তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে ভোজে হাজির হলেন। তাকে দেখেই সবাই কুর্নিশ করল। "লং লিভ খবিশ চৌধুরী, লং লিভ আওয়ার কিং" ধ্বনিতে মুখরিত হতে লাগলো চারপাশ।

খবিশ তার নিজের তৈরি করা সিংহাসনে বসলেন। বেশ একটা রাজা রাজা ভাব চলে এল তার মধ্যে। উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আজ আমি আপনাদের একটা মজার খেলা দেখাব। এই তোরা কে আছিস, আমার বেডরুমে গ্লাসে ডুবানো ব্যাঙটা ধরে নিয়ে আয় তো"।

হুকুম পালিত হল। আস্ত ব্যাঙটাকে সবার সামনে ছেড়ে দিলেন খবিশ। সবাই বলতে লাগলো, "মারহাবা মারহাবা!", "তোফা তোফা!", "হুজুরের জুড়ি নেই", "হুজুর যেমন সুন্দর হুজুরের ব্যাঙও তেমন সুন্দর" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার হাতে একটা কাঁচি নিলেন খবিশ। সবাই বলতে লাগলো, "মারহাবা মারহাবা!", "তোফা তোফা!", "হুজুরের জুড়ি নেই", "হুজুর যেমন সুন্দর হুজুরের কাঁচিও তেমন সুন্দর" ইত্যাদি ইত্যাদি।
খবিশ চেঁচিয়ে বললেন, খামোশ! তারপর ব্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ব্যাটা ব্যাঙ। লাফা তো।
ব্যাঙ লাফাতে লাগল। সবাই বলতে লাগলো, "মারহাবা মারহাবা!", "তোফা তোফা!", "হুজুরের জুড়ি নেই", "হুজুর যেমন সুন্দর হুজুরের ব্যাঙের লাফও তেমন সুন্দর" ইত্যাদি ইত্যাদি।
খবিশ এগিয়ে গিয়ে খপ করে ব্যাঙটা ধরে একটা পা কেটে দিলেন। সবাই উঃ আঃ করে উঠল। খবিশ বললেন, লাফা ব্যাঙ, লাফা।
ব্যাঙ লাফাতে লাগল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।
খবিশ ব্যাঙের আরেকটা পা কেটে দিলেন। তারপর বললেন, লাফা।
ব্যাঙ লাফাতে লাগল। সবাই আবার হাততালি দিয়ে উঠল।
খবিশ ব্যাঙের তৃতীয় পা কেটে দিলেন। তারপর বললেন, লাফা ব্যাঙ, লাফা।
ব্যাঙ তবু এক পায়ে যতটুকু সম্ভব লাফাতে লাগলো। সবাই তা দেখে বিপুল করতালিতে হলঘর প্রায় ফাটিয়ে দিতে লাগল।
এবার শেষ পা টিও কচাত করে কেটে দিলেন খবিশ। তারপর চকচকে চোখে বললেন, লাফা ব্যাঙ, লাফা।
কিন্তু এবার আর ব্যাঙ লাফাল না। খবিশ আবার বললেন, লাফা ব্যাঙ, লাফা।
কিন্তু ব্যাঙ আর লাফাল না। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খবিশ কি করে দেখার জন্য।
ঠিক তখনই হু হু হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন খবিশ। বললেন, তোমরা সবাই বল তো, আজকের এই ঘটনা থেকে আমরা কি বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি ?

কেউ উত্তর দেবার সাহস করল না। দু একজন সাহসী হয়ে বলতে গেল, পা কেটে ফেললে ব্যাঙ লাফাবে কি দিয়ে ? কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না কারও।

ঠিক তখনই আবার হু হু হা হা করে হেসে উঠলেন খবিশ। বললেন, এই জন্যেই আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ! কারণ সাধারণ মানুষ যেখানে দেখে সাধারণ ঘটনা, সেখানে আমি দেখি অসাধারণ কোন রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ! হ্যাঁ, প্রকৃত বিজ্ঞানীর স্বভাব এটাই। এবং আমিই যে পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত বিজ্ঞানী তা বলাই বাহুল্য।

এটুকু বলে সমর্থনের আশায় আশেপাশে তাকালেন খবিশ। দেখলেন, সবাই তার নামে স্লোগান দিচ্ছে।

খবিশ চৌধুরী জিন্দাবাদ।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, জিন্দাবাদ।

খবিশ বললেন, তোমরা সবাই শোন। আজকের এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে আমরা যে নতুন, একেবারেই আনকোরা নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্তটি পাই, যা কিনা যেকোনো সময় সারা পৃথিবীর হিসাব পাল্টে দিতে পারে, মুহূর্তেই সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে, সেটা হচ্ছে...নাটকীয়ভাবে থামলেন তিনি।

সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল তিনি কি বলেন শোনার জন্য।

ঠিক তিন সেকেন্ড পর উচ্চারণ করলেন খবিশ চৌধুরী, *ব্যাঙের চার পা কেটে ফেললে সে আর কানে শুনতে পায় না!!!* ওরে তোরা কে কোথায় আছিস শিগগিরি আমার সূত্র প্যাটেন্ট করার ব্যবস্থা কর!!!

সাথে সাথে চারপাশের সব দেয়ালে বড় বড় করে সূত্রটা দেখানো হতে লাগল। তারপর ঐ সূত্রের জায়গায় দেখা গেল খবিশ চৌধুরীর মুখ। আসল খবিশ চৌধুরী আনন্দে হু হু হা হা করে হাসতে লাগলেন।

৭

প্রফেসর মিরাজের হাতে একটা ছোটখাটো ম্যাপ। তাছাড়া পকেটে বিভিন্ন ছোটখাটো যন্ত্রপাতি, যেমন লেসার বিকন, ট্রাঙ্কুইলাইজার, জি পি এস ট্র্যাকার ইত্যাদি। এগুলো দিয়েই তাকে খবিশের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ একটা সিনেমা হলের সামনে পোস্টারের দিকে চোখ আটকে গেল তার। তিনি দেখলেন, "কিং খানঃ Eat the king" সিনেমার পোস্টারে লাস্যময়ী অঙ্গভঙ্গি করে রয়েছে একজন...আরে! এটা ছেলে না মেয়ে ?
মজা দেখতে সিনেমা হলে ঢুকে গেলেন মিরাজ। মিশনের কথা প্রায় ভুলেই গেলেন। প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলেন কিং খান সিনেমার মারামারি।
বেরিয়ে আসার পর একটা রিকশায় উঠলেন তিনি। একটু অন্ধকারের দিকে যেতেই কোথা থেকে বেরিয়ে এল কালো পোশাক আর মুখোশ পরা একগাদা লোক। প্রত্যেকের হাতে ভারী ভারী বন্দুক আর গুলি।

তারা মিরাজের রিকশাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরল। একজন সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হিস হিস হিস হিস।
মিরাজ বললেন, কি কইলি?
সে আবার বলল, হিস হিস হিস হিস।
মিরাজ বললেন, হিসু ? হিসু করবি ?
সে মাথা নাড়িয়ে এবার অনেক কষ্ট করে স্পষ্ট করে বলল, ব্যাগটা দিয়ে দে।
মিরাজ বললেন, কিয়ের ব্যাগ ?
যেইটায় খবিশ চৌধুরী সংক্রান্ত ইনফরমেশন আছে।
না, দিমু না। হঠাৎ ই যেন অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তিনি।
সামনে এগিয়ে আসা লোকটি এবার বাকি সবার উদ্দেশ্যে বলে, হিস হিস হিস হিস। ব্যস, সবাই পিস্তল লোড করে এগিয়ে আসে।
সামনের লোকটা বলে, রেডি ?

সবাই বলে, হিস হিস।
স্টেডি ?
হিস হিস।
গো...
ভয়ে মিরাজ চোখ বন্ধ করেন। পৃথিবীতে কি আজই তার শেষ দিন?

গো বলার সাথে সাথে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে মিরাজের ভুঁড়ির উপর। ভুঁড়ি চটকাতে থাকে পাগলের মত। মিরাজ হা হা, উঃ হু, কাতুকুতু লাগে, ইত্যাদি বলে হু হু করে হাসতে থাকেন।
লিডার বলে ওঠে, স্টপ!
সবাই থেমে যায়। মিরাজ তখনও হাসি থামাতে পারছেন না।
সবাই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। লিডার বলে, ইওর গেম ইজ আপ। তোমার সব যন্ত্রপাতি আমরা নিয়ে নিয়েছি।
মিরাজ পকেট হাতড়ান। হায় হায়, এরা কাতুকুতু দেবার ফাঁকে মানিব্যাগ নিল কখন? মোবাইলটাই বা নিল কখন ?
কি খুঁজছ, মিরাজ ? বলে ওঠে লিডার, খবিশকে ধরার জন্য সি আই এর কাছ থেকে যে খেলনাগুলো তুমি নিয়েছিলে সেগুলো এখন আমাদের কব্জায়। হু হা হা হা। বলে হাতের ব্যাগটা দেখায় সে।

মিরাজ না-আ-আ-আ বলে লাফ দিয়ে ধরতে যান ব্যাগটা। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই হিস হিস করতে করতে পালায় ব্ল্যাক নিনজার দল। ধ্যাত, মুডটাই নষ্ট করে দিল, বলে ওঠেন মিরাজ। কিন্তু তার পরেই হাসিতে তার দম ফেটে যাবার জোগাড় হয়। ইনফরমেশন অলা ব্যাগটা তো তিনি সিনেমা হলে ফেলে এসেছেন! তাহলে ওরা কোন ব্যাগ নিয়ে গেল ? হা হা হা হা।

কিছুক্ষণ পর। খবিশ চৌধুরীর পোষা ব্ল্যাক নিনজার লিডার ফার্মগেট ওভারব্রিজের উপর বসে হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাল, চার্লি ওভার। আলফা ওভার ওভার। রজার দ্যাট। কপি দ্যাট অফিসার।
সেটা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আরেকজন বলল, আপনি এত সাংকেতিক ভাষা জানেন বস ?
হ্যাঁ জানি, বলে উঠল পাম খেয়ে ফুলে ওঠা লিডার। এইবার দোকান থেইকা ওয়াকি টকির দুইটা ব্যাটারি কিনে নিয়ে আসো।

ব্যাটারি এল। লিডার বলল, হেডকোয়ার্টার! উই হ্যাভ ব্যাড ইনফরমেশন।
হোয়াট ?
ঐ বেঁটে মিরাজের কাছ থেকে আমরা যে ব্যাগটা উদ্ধার করেছি তাতে কোন ম্যাপ বা কোন ট্র্যাকিং ডিভাইস ছিল না।
হোয়াট দ্য ফাক! তাহলে তোমরা কি উদ্ধার করেছ ?
মানিব্যাগ থেকে নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা, মোবাইল থেকে জি পির একশটা মেসেজ, আর ব্যাগের ভিতর থেকে রহস্যময় একটা সামুদ্রিক প্রাণী।
রহস্যময় প্রাণী? কি সেই রহস্যময় প্রাণী? না চিনলে ছবি মেইল কর এখনই।

ওকে বস, লিডার তার চাইনিজ নোকিয়া মোবাইল বের করে গভীর মনোযোগ দিয়ে পুঁটি মাছের ছবি তুলতে লাগলো।

****

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝেই। আশেপাশে ধূলার ঠেলায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রে অশান্ত স্রোত। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যা পারে। ঠিক এরই মধ্যে সাগরপাড়ে বালির মধ্যে কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে একজন নারীর। সে চিৎকার করছে, বাঁচাও! বাঁচাও! তার চারপাশে কিছু চুল লম্বা মানুষ হু হা হা করে হাসছে। তাদের মধ্যে মোটামত যে, সে বলল, সুন্দরী, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না।
সুন্দরী তবু বলতে থাকল, বাঁচাও, বাঁচাও!

ঠিক তখনই যেন আকাশ ফুড়ে উদয় হল বুকের বোতাম খোলা, ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়া একজন মানুষ। সে এসেই ভিলেনদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে লাগলো। ব্যাকগ্রাউন্ডে “ইয়া ঢিশা”, “ঢিশুমাইক” ইত্যাদি শব্দ শোনা যেতে লাগলো। আর আঃ আঃ করতে করতে উড়ে বিভিন্ন দিকে পড়তে লাগল শয়তানরা। সব শয়তান খতম হতেই ঝড়বৃষ্টি চলে গেল, সুন্দর রোদ চলে এল কোথা থেকে। নায়ক এক চুটকিতে নায়িকাকে বালির নিচ থেকে তুলে আনল। তুলে আনতে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে নায়িকা নায়কের বোতাম খোলা প্রশস্ত বুকে লুটিয়ে পড়ল। সাথে সাথে চিৎকার করে কেউ বলল, কাট !!

ছাকিপ খান হাঁফ ছেড়ে তার চেয়ারে বসলেন। তাকে উপর থেকে বাতাস করতে লাগল ইউনিটের ছোট ছোট ছেলেরা।
ছাকিপ খান পকেট থেকে আয়নাটা বের করে ঠোঁটের কালার ঠিক আছে কি না দেখতে লাগলেন। তারপর পরিচালকের উদ্দেশ্যে বললেন, একটা ম্যাজেন্টা কালারের লিপস্টিক এনে দিতে বলেছিলাম, মনে আছে?
পরিচালক বললেন, আজকেই আইনা দিমু বস। কাইল মনে ছিল না।
ছাকিপ বললেন, আমি একটু মেক আপ রুমে যাইতেছি।
পরিচালক বললেন, আবার মেক আপ রুম ? আজকেই তো তিনবার মেক আপ নিছেন বস!
ছাকিপ বললেন, মেক আপের তুমি কি বুঝবা ? সবাই কি আর “স্টাইল” বোঝে ? চলে গেলেন ছাকিপ।

সবে তিন পরত পাউডার মুখে লাগিয়েছেন, এমন সময় তার মেক আপ রুমের দরজা দিয়ে কেউ ঢুকল।
ছাকিপ বললেন, কে কে ?
পিছন থেকে কেউ বলল, ইটস প্রফেসর মিরাজ। নাইস টু মিট ইউ, লেডি।

খবিশ চৌধুরীর আস্তানা।

পায়ের উপর পা তুলে টিভি দেখছেন খবিশ চৌধুরী। তার সাম্রাজ্যে কোন মেয়ের প্রবেশাধিকার নেই। তাই তার চ্যানেলেও কোন মেয়ে নেই। সব ছেলে।
এমন সময় তার খানসামা এসে খবর দিল, হুজুর, কোহেকাফ নগরের রাজার কাছ থেকে একটা উপঢৌকন এসেছে।
কোহেকাফ নগর ? সেইটা আবার কোথায় ?
জানি না। গুগুল সার্চ দিয়েও পাওয়া যায় নি।
আচ্ছা ! কি উপঢৌকন ?
সেইটা তো আপনি না গেলে বোঝা যাবে না।
আচ্ছা চল চল। খবিশ চৌধুরী জামাকাপড় পড়তে লাগলেন।

গিয়ে দেখলেন তার দরবারে সবাই বসে আছে। তাকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে "লং লিভ খবিশ চৌধুরী", "লং লিভ আওয়ার কিং" ইত্যাদি বলতে লাগল।
খবিশ দেখলেন, দরবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, আরে! এইটা পোলা না মাইয়া ? তার পাশে বড় একটা বাক্স।
খবিশ বললেন, এইটা কি ?
পাশে দাঁড়ানো মানুষটা বলল, এইটাই আপনার উপঢৌকন।
কি আছে এর মধ্যে ?
তার আগে আমাদের রাজার একটা শর্ত আছে।
কি শর্ত ?
আমাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আপনার হেড খানসামা বানাইতে হবে। আমি যখন চাইব তখন আপনার মহলে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না।
ক্যান ? বলে উঠলেন খবিশ, কি এমন উপঢৌকন নিয়ে এসেছ তুমি ?
আগে বলেন রাজি ?
না আগে দেখাও।
না আগে বলেন রাজি ?
আচ্ছা আমি রাজি, জেদের বশে বলে ফেললেন খবিশ চৌধুরী। এইবার বল।

মানুষটা একটা সুইচে চাপ দিতেই বাক্সটা খুলে গেল। ওটার মধ্যে দেখা গেল একটা বড় খাঁচা। এবং সেই খাঁচার মধ্যে...মানুষটাকে দেখেই আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলেন খবিশ চৌধুরী। চিৎকার করে বললেন, পাইলাম, উহাকে পাইলাম!!

খবিশ আনন্দে নাচতে লাগলেন। খাঁচার পাশে দাঁড়ানো মানুষটাকে বললেন, শুধু হেড খানসামা ক্যান, তুমারে চাইলে আমি আরও বড় পোস্ট দিতে পারি। আমার আরও কাছের কোন পোস্ট... জাস্ট মেনশন ইট, বেবি!

খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করা প্রফেসর মিরাজের দিকে তাকিয়ে ঘৃণাভরে থু থু নিক্ষেপ করে এগিয়ে গেল ছাকিপ খান।

****

সি আই এ হেডকোয়ার্টার।

ইলোরা হন্তদন্ত হয়ে রাহাত খানের রুমে ঢুকল। রাহাত খান ওকে দেখে তাড়াতাড়ি ব্রাউজারটা মিনিমাইজ করে দিলেন।
ইলোরা বলল, বস বস! খবিশকে ধরতে পারলে আমাদেরকে প্রফেসরের যে সংকেত পাঠানোর কথা ছিল তা পাঠানো হয়েছে।
মানে ? উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন রাহাত খান। খবিশ এখন হাতের মুঠোয় ?
মনে হয়। আমরা এখনই ফোর্স পাঠিয়ে দিই।
না না, আমিও যাব সাথে। আর হ্যাঁ, তুমিও যাবে।
একটু পরেই সি আই এর প্রাইভেট লেগুনায় করে রাহাত খান ও তার দলবলকে ছুটে চলতে দেখা গেল।

****

খবিশ চৌধুরীর প্রাইভেট চিড়িয়াখানা। একটা গাধার খাঁচায় গাধার পাশে প্রফেসর মিরাজকে রাখা হয়েছে। খবিশ এখন দিনে দশ বারোবার এই খাঁচাটা দেখে যান। মিরাজের প্রতি তার আক্রোশ বহুদিনের। অনেক দিন ধরেই তিনি মিরাজের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সুযোগ মিলছিল না। আজ হঠাৎ করেই সেই সুযোগটা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে তার।
খবিশ বললেন, তুমি না, আমিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।
মিরাজ বললেন, না, তুমি একটা ভুয়া বিজ্ঞানী। তুমি কোন বিজ্ঞানীই না।
হোয়াট! খেপে গেলেন খবিশ। আমি বিজ্ঞানী না?
না। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের উপকারের জন্য। তুমি তোমার বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের কোন উপকার কর নি।

হা হা হা, ওরে বিবেক রে! ব্যঙ্গ করলেন খবিশ। বিবেকের সংজ্ঞা যে যুগে যুগে দেশে দেশে চেঞ্জ হয় তুমি জানো ?

না, চেঞ্জ হয় না। চেঞ্জ হয় শুধু তোমার মত শয়তানরা।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন খবিশ। বললেন, ঠিক আছে, হয়ে যাক বুদ্ধির পরীক্ষা। দেখা যাক কে বেশি বুদ্ধিমান।

ঠিক আছে, দেখা যাক।

খবিশ বললেন, এক যোগ এক ক ত?

মিরাজ বললেন, দুই।

খবিশ বললেন, হয় নাই! হয় নাই! আমি তো বাইনারিতে ধরসিলাম। উত্তর হবে দশ।

মিরাজ বললেন, তাহলে বল, পাই আর এপসিলন নট এর মধ্যে কোনটা ধ্রুবক?

খবিশ ভেবেচিন্তে বললেন, দুইটাই ধ্রুবক।

মিরাজ বললেন, হয় নাই। আমি তো অঙ্কের পাই এর কথা বলি নাই, ঐ যে বাজারে কেক পাওয়া যায় ঐ পাইয়ের কথা বলেছিলাম। যেমন, ভ্যানিলা পাই।

খবিশ বুঝলেন, এই লাইনে হবে না। তিনি বললেন, তাহলে বল, একটা অনেক বড় গর্তে কতটুকু মাটি থাকতে পারে ?

মিরাজ বললেন, একটুও না। কারণ গর্তে মাটি থাকে না। এইবার তুমি বল, সাইবেরিয়ায় সূর্য কোন দিক দিয়ে ওঠে ?

খবিশ বললেন, উত্তর দিক ?...

মিরাজ বললেন, হয় নাই। সূর্য কখনও ওঠে না। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে গিয়ে নিজের অক্ষের চারপাশেও ঘুরতে থাকে। তাই একেক সময় সূর্য আকাশের একেক জায়গায় থাকে।

হাল ছেড়ে দিলেন খবিশ। এইভাবে হবে না। অন্য কোনভাবে অপদস্থ করতে হবে মিরাজকে।

****

প্রচণ্ড গতিতে লেগুনা ছুটিয়ে ট্র্যাকারের নির্দেশিত পথে আগাচ্ছেন রাহাত খান। চোখেমুখে তার চাপা উত্তেজনা। আজ খবিশকে ধরতে পারলে তার প্রমোশন আর কে আটকায় ?

একটু পরেই ইলোরা বলল, বস, সিগন্যাল পাচ্ছি। আশেপাশেই কোথাও আছে ওরা।

রাহাত খান পকেটের পিস্তলটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। হ্যান্ডকাফটাও। শয়তানটাকে গ্রেফতার তিনি নিজেই করতে চান। অন্য কেউ এসে তার ক্রেডিট নিয়ে যাক এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

বিপ বিপ করা শুরু করল বিপার। রাহাত খান নেমে পড়লেন লেগুনা থেকে। একঝাঁক সশস্ত্র সৈন্য এগিয়ে গেল সিগন্যাল লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ, এই ঘরের মধ্যেই আছে ওরা। রাহাত খান সংকেত দিলেন। ভারী বুটের লাথিতে ভেঙ্গে পড়ল ছুপড়ি ঘরের দরজা।

ভিতরে একটা বাচ্চা মুখে একটা রিমোটের মত যন্ত্র নিয়ে চুষছিল। অস্ত্র হাতে এতগুলো সৈনিক দেখে সে ভয়ে যন্ত্রটা মুখ থেকে ফেলে দিল। এক মুহূর্ত পরেই প্যান্ট ভিজে গেল তার।

রিমোটের মত যন্ত্রটার দিকে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন রাহাত খান। ইলোরাও ভেবে পেল না, যে যন্ত্রটা প্রফেসর মিরাজের কাছে থাকার কথা সেটা এই পিচ্চির মুখে এল কিভাবে ?

****

গাধার খাঁচায় শুয়ে নাক ডাকছেন প্রফেসর মিরাজ। এমন সময় হাতে একটা ল্যাপটপ নিয়ে সেখানে হাজির হল খবিশ চৌধুরী।
এই মিরাজ, এই!
কে কে? ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলেন মিরাজ।
আমি। গেট আপ বেবি, এবার দেখা যাবে তোমার বুদ্ধির দৌড় কতটুকু।
মিরাজ হাই তুলে বললেন, আবার কি করতে হবে?
খবিশ তার ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে বলল, একটা মেয়েকে ফেইসবুকে ফ্রেন্ড রিকু পাঠাতে হবে। যারটা মেয়ে আগে একসেপ্ট করবে সেই উইনার।
মিরাজ আবার হাই তুলে বললেন, ঠিক আছে। কোন মেয়ে?
খবিশ আন্দাজে একটা বাংলাদেশি মেয়ের নামে সার্চ দিলেন। “ইশিকা আক্তার” নামের একটা আই ডি তার খুব পছন্দ হল।
খবিশ বললেন, প্রথমে তোমার পালা। পাঠাও।
মিরাজ নিজের আই ডি তে ঢুকে “Add Friend” এ চাপ দিয়ে লগ আউট করে ঘুমাতে গেলেন। অচিরেই নাক ডাকতে শুরু করলেন তিনি।
এবার খবিশের পালা। খবিশ বড় একটা মেসেজ লেখা শুরু করলেন। সেটার বঙ্গানুবাদ অনেকটা এরকম...

আপনি দেখতে অনেকটা আমার বড়বোনের মত। আপনার প্রো পিক দেখে আমার অনেক দিন আগে হারানো বড় বোনের কথা মনে পড়ে গেল। এজন্যেই আপনাকে অ্যাড দিলাম। আমি জাস্ট আপনার ফেইসবুক ফ্রেন্ড থাকব, আর কিছু হতে চাইব না, প্রমিজ। বাই ডি ওয়ে, আপনার প্রো পিক অনেক সুন্দর। আপনার ফেইসবুক ইমেজ যেরকম সুন্দর, আপনিও কি সেরকম সুন্দর ?

মেসেজ পাঠিয়ে ফ্রেন্ড রিকু পাঠালেন খবিশ চৌধুরী। দেখা যাক সুন্দরী কাকে একসেপ্ট করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে ফেইসবুকে ঢুকে দেখা গেল, মেয়েটা মিরাজকে অ্যাড করেছে। ও, আর খবিশকে ব্লক করেছে।

৯

মিরাজ বললেন, মেয়েদের প্রতি তোমার এত আক্রোশ কেন ?
খবিশ কমলা সুন্দরীর ঘটনা সংক্ষেপে বলল। মিরাজ বললেন, আরে, মেয়েরা তো এইরকমই। যেইখানে টাকা দেখে সেইখানে লাফায়া পড়ে। আমার বউও আমারে ছাইড়া চইলা গেছে। তাতে কি হইছে? একটা গেছে আরেকটা আসবে।
খবিশ বললেন, না মিরাজ না। আমি মেয়েমানুষ চাই না। আমি চাই প্রতিশোধ। এই পৃথিবীতে কোন মেয়েমানুষ থাকবে না। সবাইকে ছেলে বানিয়ে দেব আমি।
তাইলে পৃথিবীতে মানুষের বংশবৃদ্ধি হবে কিভাবে ?
কৃত্রিম গর্ভ বা ইনকিউবেটর তৈরির কাজে আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি। ওটার মাধ্যমে মায়ের গর্ভ ছাড়াই ফিটাস বড় হয়ে উঠবে।
আর ওভাম ? মেয়ে না থাকলে ওভাম পাইবা কোথায় ? স্পার্ম আর ওভাম একসাথে না হইলে জাইগোট হইব কিভাবে ?
হে হে, সেই ব্যবস্থাও আছে। আমার ওভাম ব্যাঙ্কে জমানো আছে হাজার হাজার ওভাম। সেই ওভাম কখনও নষ্ট হবে না। সেইখান থেকে ইচ্ছামত ওভাম নিয়ে জাইগোট তৈরি করা যাবে।
মিরাজ আঁতকে উঠলেন। তারপর বললেন, তুমি কি মেয়েদের একদমই দেখতে পারো না ? তোমার এই সাম্রাজ্যে কি একটাও মেয়ে নাই ?
খবিশ বললেন, না। নাই। শুধু মানুষ কেন, কোন মেয়ে পশুপাখিও নাই। পোকাও নাই। কোন মেয়ের ছবিও নাই। টিভিতেও কোন মেয়ে দেখানো হয় না।
কিন্তু, বললেন মিরাজ, তোমার শরীরের প্রতিটি কোষে যে ৪৬ টা ক্রোমোসোম আছে, তার মধ্যে ২৩ টাই তো মায়ের কাছে থেকে আনা। তাই না ? তাহলে তো তোমার শরীর থেকে সেই জিনিসটাও সরিয়ে ফেলতে হবে।

রাগে ফুঁসে উঠলেন খবিশ। এই কথার কোন উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেলেন না তিনি। যত বড় নারী বিদ্বেষীই হোক, কোন পুরুষ কি দাবী করতে পারবে যে তার শরীরে মায়ের শরীরের একটা অংশ নাই ?

মিরাজ বললেন, কিন্তু কখনও যদি তোমাকে কোন মেয়ের সাথে দেখা যায়, তাহলে কি হবে ?
খবিশ বললেন, হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমার ঘোষণা তো আছেই। আমি যদি কখনও কোন নারীকে স্পর্শ করি, নরম স্বরে কথা বলি, বা একই ঘরে অন্যের চোখের আড়ালে এক মুহূর্তও থাকি, তাহলে আমি এই সাম্রাজ্যের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেব। বাট দ্যাটস নেভার গনা হ্যাপেন, ইউ নো ?
মিরাজ বললেন, সত্যি তো ?
খবিশ বললেন, সত্যি। আচ্ছা অনেক প্যানপ্যান করলাম কিন্তু কাজের কথা বললাম না। তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।
কি প্রস্তাব ?

তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর। তোমাকে আমি আমার প্রধান উজির বানিয়ে নিব। দুইজনের বুদ্ধিতে সারা পৃথিবীকে পায়ের নিচে এনে ফেলব আমরা।
আর নাহলে?
নাহলে কাল তোমাকে ফাঁসি দেয়া হবে। তারপর তোমার মগজ নিয়ে গবেষণা করা হবে। তোমার মুণ্ডুহীন কল্লার ছবি সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হবে।
আমি রাজি।
রাজি ? লাফ দিয়ে উঠলেন খবিশ। হবে ? হবে আমার প্রধান উজির ?
না। কালকেই মরতে চাই আমি। বুড়ো বয়সে এত কষ্ট সহ্য হচ্ছে না।

****

রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আন্ডারওয়ার পরে বিছানার উপর একটু নাচানাচি করার স্বভাব আছে খবিশ চৌধুরীর। আর কালকে মিরাজকে সর্বসমক্ষে ফাঁসিতে ঝুলাবেন এটা ভেবেই অন্যরকম একটা আনন্দ হচ্ছিল খবিশের। তাই লাফালাফির মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল তার।
শব্দ শুনে রুমে ঢুকে পড়েছিল প্রধান খানসামা ছাকিপ খান। মালিকের এ অবস্থা দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করে চলেই যাচ্ছিল সে।
কিন্তু ছাকিপের লাল ঠোঁট দেখে পুরনো একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল খবিশের মাথায়। বয়স হয়েছে, কিন্তু যৌবনের সেই দুষ্টু দুষ্টু অনুভূতিগুলো তো এখনও মিলিয়ে যায় নি তার।
খবিশ বললেন, এই ছাকিপ। কাছে আসো।
ছাকিপ কাছে আসলো। তার বুক তখন তিরতির করে কাঁপছে।

****

দৌড়াও! দৌড়াও!
অবাক হয়ে ঘাড়ে খবিশের তিনটা প্যান্ট পেঁচিয়ে সারা ঘরে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে লাগলো ছাকিপ। খবিশ বাচ্চাদের মত আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন।

****

দৈনিক পত্রিকায় বড় করে বের হল, “প্রখ্যাত নায়ক ছাকিপ খান নিখোঁজ। তবে তাকে নাকি বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। সর্বশেষ নাকি দেখা গেছে মালিবু স্ট্রিপার ক্লাবে গান গাইতে। তবে তথ্যটি নিশ্চিত করা যায় নি। যে তার সন্ধান দিতে পারবে তাকে ছাকিপ খানের নেক্সট সিনেমায় সাইড রোল দেয়া হবে”।

১০

নিজের অফিসে বসে ল্যাপিতে সবে ফেসবুকে লগইন করেছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ইলোরা। বলল, বস, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঐ শয়তান খবিশ চৌধুরী আমাদের প্রফেসর মিরাজকে ধরে ফেলেছে। তাকে নাকি আজকে ফাঁসি দেয়া হবে। সেই ফাঁসির দৃশ্য নাকি লাইভ নেটে দেখানো হবে।
তাই ? সর্বনাশ!
তাড়াতাড়ি ফেসবুক বাদ দিয়ে ঐ খবিশ চৌধুরীর সাইট খুঁজে বের করলেন রাহাত খান। একটু খুঁজতেই লাইভ স্ট্রিমটা পেয়ে গেলেন তিনি।
ভিডিওতে দেখা গেল, প্রফেসর মিরাজকে সবার সামনে বেঁধে রাখা হয়েছে। খবিশ বলছে, আমার সাথে বেয়াদপি করার জন্য আজ তোকে ফাঁসি দেয়া হবে। হু হু হা হা।
মিরাজ বলছে, আমি আবার কি বেয়াদপি করলাম?
খবিশ বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, প্রতারণা করার জন্য তোকে ফাঁসি দেয়া হবে। হু হু হা হা।
মিরাজ বলছে, আমি আবার কি প্রতারণা করলাম?
খবিশ বিরক্ত হয়ে বলছে, আমার ইচ্ছা তোকে ফাঁসি দেয়া হবে। হইসে ?
মিরাজ মুখ বাঁকা করলেন।

ভয়ে রাহাত খানের কলিজা শুকিয়ে গেল। শেষ, তার সব শেষ। এই মিশনে ফেল হলে আর জীবনেও প্রমোশন হবে না তার।

****

খবিশ চৌধুরীর আস্তানা

মিরাজকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ানোর সাথে সাথে মিরাজ বলে উঠলেন, আমার একটা কথা ছিল।
খবিশ বললেন, কি কথা ?
আপনিই তো বলেছেন *আমি যদি কখনও কোন নারীকে স্পর্শ করি, নরম স্বরে কথা বলি, বা একই ঘরে অন্যের চোখের আড়ালে এক মুহূর্তও থাকি, তাহলে আমি এই সাম্রাজ্যের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দেব।* বলেন নাই ?
হু বলছি। তাতে কি হইছে ?
আচ্ছা, যে প্রমাণ করতে পারবে যে আপনি কোন মেয়ের সাথে ইটিশ পিটিশ করেছেন তাকে কি পুরষ্কার দেয়া হবে ?
তাকে...তাকে আমার রাজত্বের পুরোটাই দিয়ে দেয়া হবে।
তাহলে আমিই পাচ্ছি রাজত্ব, হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বললেন মিরাজ, ছাকিপ একটু এইদিকে আসো তো।

ছাকিপকে দেখে চোখ রসগোল্লার মত বড় বড় হয়ে গেল খবিশের। আরে ! এ কে ? কাল রাতে এমন লাগলো, আর এখন এমন লাগছে কেন ?
মিরাজ বললেন, কালকে তুমি এর সাথে রাত কাটাও নাই ?
খবিশ ভয়ে ভয়ে বললেন, কাটাইছি।
ফষ্টিনষ্টি কর নাই ?
করছি।
খেলাধুলা কর নাই ?
করছি।
এবার মিরাজ অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দেখুন, উপস্থিত জনতা। আপনাদের লিডার নিজের মুখেই স্বীকার করলেন গত রাতে তিনি একজনের সাথে কি করেছেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন সে একজন নারী ? মানে মেয়ে ?

সাথে সাথে দরবারে চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। খবিশ চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, ঐটা যে মাইয়া প্রমাণ দে। প্রমাণ দে হারামজাদা!
মিরাজ বললেন, ছাকিপ, বুড়ো খোকাকে তোমার ছলাকলা দেখিয়ে দাও তো।

ছাকিপ সামনে এসেই বুকের বোতাম খুলে খবিশের চারপাশ ঘুরে মেয়েলি নাচ নাচতে লাগলো। নাচের এক পর্যায়ে খবিশকে একটা চুমু দিয়ে সে যখন বুকের আরেকটা বোতাম খুলতে যাবে, খবিশ বলে উঠলেন, নাআআআআআ। এইটা তো দেখি মাইয়া!!!!

ব্যস, সাথে সারা দরবারে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। মানুষজন খবিশের দিকে পচা ডিম নিক্ষেপ করতে লাগল। খবিশ এই ফাঁকে পালাতে গেল। মিরাজ চিৎকার করে বললেন, ওকে ধর! পালাতে দিস না!

খবিশকে ধরে বেঁধে ফেলা হল। খবিশ বলল, এইটা তাইলে তোরই ষড়যন্ত্র, না?
মিরাজ বললেন, ষড়যন্ত্র বলতাছোস ক্যান ? প্ল্যান বল। প্ল্যান টু ইলিমিনেট এ ক্রিমিনাল লাইক ইউ।

খবিশ তাকে ধরে রাখা গার্ডের গায়ে আঁচড় কামড় মারতে লাগলেন।
গার্ড বলে উঠল, কাতুকুতু দেস ক্যান ? কাতুকুতু দেস ক্যান ?

১১

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত।

খবিশের মত রাঘব বোয়ালকে জালে আটকে সরকারের হাতে সোপর্দ করার জন্য প্রফেসর মিরাজকে প্রথমে ভুল করে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয়েছিল, পরে কমিটি তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাকে "সাহসী জেলে" উপাধিতে ভূষিত করে।

মেয়েকে ছেলে তৈরির ওষুধের কারখানা ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু ধ্বংস করার আগে কাউকে গোপনে এক বালতি ওষুধ খেয়ে নিতে দেখা যায়।

ছাকিপ খানকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাকিপের ফ্যানরা কাকুতি মিনতি করে, ওরে আমার ছাকিপকে ফিরিয়ে দে। আমার কোলে এনে দে। মেয়েটা একা রাস্তায় কোথায় হারিয়ে গেল। কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে এনে দেয় না।

কিন্তু কদিন পরেই এফডিসিতে একজন নতুন নায়কের আমদানি ঘটে। নায়ক অতিরিক্ত সুপুরুষ। প্রথমে এসেই সে পারলে ধর (Catch me if you can), ছাঁচ (The Matrix), আংটিগুলার মালিক (Lord of the rings), দ্রুত এবং ক্ষিপ্ত (The fast and the furious), এম ভি টাইটানিক ইত্যাদি সিনেমায় অভিনয় করা শুরু করে। দ্রুতই দর্শক মনে স্থায়ী আসন গেড়ে নিতে সক্ষম হয় এই অসম্ভব সুপুরুষ নায়কটি। মেয়েরা দ্রুতই তাকে নিজেদের হৃদয়ের সম্রাট বানিয়ে নেয়। কিন্তু এই নায়কের সাথে কার যেন, খুব পরিচিত কার যেন কি একটা মিল আছে, যা কেউই বুঝতে পারে না।

****

যথাসময়ে বিচার হয় খবিশ চৌধুরীর। বিচারে তাকে নিজের তৈরি ওষুধ ডেট এক্সপায়ারড হবার পর প্রতিদিন তিন বালতি করে খাবার শাস্তি দেয়া হয়। প্রথম দিকে খবিশ একদমই ওষুধগুলো খেতে চাইতেন না, খালি হাউকাউ করতেন। কিন্তু পরে প্রতিবার ওষুধ খাওয়ানোর আগে তার জায়গামত সিদ্ধ ডিম ট্রিটমেন্ট দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। সিদ্ধ ডিম ট্রিটমেন্ট খাবার ভয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত ঢকঢক করে নিজের তৈরি ডেট এক্সপায়ারড ওষুধ গিলতে থাকেন খবিশ।

নয় মাস পর।

তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে খবিশ চৌধুরীর। ব্যথায় আঃ উঃ করে চিৎকার করছেন তিনি। এমন সময় সেখানে এল জেলের ডাক্তার। তিনি এসে ভাবগতিক দেখে একটা আলট্রাসনোগ্রাম করানোর নির্দেশ দিলেন।

আলট্রাসনোগ্রাম করানো হল। ডাক্তার এসে বললেন, অভিনন্দন ! আপনি বাবা হতে চলেছে ন! ইটস এ হিজড়া !

খবিশ ভয়ে ভয়ে নিজের তলপেটের দিকে তাকালেন। মূত্রাঙ্গের গোঁড়াটা আস্তে আস্তে ফুলে উঠছে তার। ব্যথা হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে গেল।

খবিশ অবাক হয়ে দেখলেন, তার মূত্রাঙ্গের ছিদ্র অনেক বড় হয়ে গেছে। আর সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বড় আঙ্গুল।

খবিশ চৌধুরী ভয়ানক আতঙ্কে নাআআআআআআআ বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

প্রফেসর মিরাজ ও স্বপ্নযন্ত্র

1.

রাস্তা চিরে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলছে মালবাহী ট্রাক। ট্রাকের পিছনটা ঢাকা, ভিতরে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। ট্রাক চালাচ্ছে মফিজ। মফিজ পান করে ঈষৎ টাল। এমনিতে সে এমন পান-টান করে না, কিন্তু আজকে তার স্পেশাল ডে। এমন সুযোগ সারা জন্মে একবার মেলে।

ট্রাকের পিছনটায় মানুষের চোখের আড়ালে একটা মেয়েকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মেয়েটাকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে যে সে একটুও নাড়াচাড়া করতে পারছে না। চিৎকারও দেবার অবস্থা নেই, মুখটাও তার টেপ দিয়ে বাঁধা।

মফিজ এবং তার দুই বন্ধু আসগর ও কাশেম ঠিক কেন মেয়েটাকে অপহরণ করেছে সেটা নিয়ে তারা নিজেরাও নিশ্চিত নয়। তবে একবার যখন করা হয়েছেই, ফিরে যাবার উপায় আর এখন নেই। মেয়েটাকে ভোগ করে মেরে ফেলা ছাড়া গতি নেই। আশার কথা এই যে, অপহরণের সময় কেউ দেখে না। মেয়েটাকে তারা নির্জন একটা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। মফিজ ওখানে মুততে গিয়েছিল, আসার পথে একে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে।

ট্রাকের পিছনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় যে মেয়েটি কাঁদছে আর মনে মনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সেই মেয়েটির নাম শায়লা। শায়লার বয়স বারো বছর, প্রিয় বন্ধু রেজার সাথে অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে কাউকে না বলে এই পোড়াবাড়িতে এসেছিল সে। রেজা বলেছিল এখানে নাকি ভুত আছে, শায়লা বলেছিল ভুত বলে কিছু নেই। অবলা মেয়ে ভুলে গিয়েছিল ভুত বলে কিছু না থাকলেও মানুষ বলে একটা প্রজাতি আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ প্রজাতি, ভুতের চেয়ে হাজার গুণ ভয়ঙ্কর এই মানুষ।

রেজা এখন কোথায় ? রেজা এখন কি করছে ? তাকেও কি ওরা ধরে এনেছে ? নাকি মেরে ফেলেছে ? নাকি রেজা এতক্ষণে সবাইকে জানাতে সক্ষম হয়েছে ? এখন কি তাকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ আসছে? কখন আসবে ? এরা কারা ? এরা তাকে কি করবে ? আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতেই আবার প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শায়লা।

মফিজ ট্রাক থামাল। ট্রাকটাকে একটা জঙ্গলের মত জায়গায় আনা হয়েছে। এবার আসল কাজটা করতে হবে। তিনজনের মধ্যে কাশেমের ধৈর্য সবচেয়ে কম। ট্রাক থামানোর সাথে সাথে সে দৌড়ে গেল, কমবয়সী কচি মেয়েটাকে বিবসনা করে ভোগ করাটাই এই মুহূর্তে তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটা ভোঁতা শব্দ হল। এরপর কিছুক্ষণ ধরপাকড়ের শব্দ। তারপর আবার চুপ।

আসগর একটু ধীরস্থির। ধীরেসুস্থে মুতে ট্রাকের পিছনের দিকে হাঁটা দিল সে। হঠাৎ তার মাথায় কি যেন একটা পড়ল, মনে হল মাথা ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাবে। আসগর জ্ঞান হারাল।

মফিজ তখনও ড্রাইভিং সিটেই বসা। হাতে তার সস্তা মদের বোতল। এসব কাজের আগে টাল না হলে হয় না। এই টাল অবস্থায়ও বিপদের গন্ধ টের পেল মফিজ। কেন যেন তার মনে হল, কেউ একজন আছে। আশেপাশেই আছে।

মফিজ গাড়ি থেকে নামল। গাড়ির পিছনে গিয়ে তার মদ্যপ অবস্থা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। আসগরের মাথা ফেটে খুলি বের হয়ে এসেছে। কাশেমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ট্রাকের কাভারিং এর নিচ থেকে মেয়েটার গোঙ্গানি শোনা যাচ্ছে। কেউ কি তার মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছে ? কে সে ?

হুম, ভিতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। একটা ছেলেকণ্ঠ সান্ত্বনা দিচ্ছে মেয়েটাকে। বলছে, "আমি তোমাকে উদ্ধার করবই। তুমি ভয় পেও না"

মফিজ ট্রাকের ভারী জ্যাক-স্ক্রুটা হাতে তুলে নিল। একেবারে ট্রাকের পিছনে চলে এল সে।

ছেলের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, "কাঁদে না সোনা, কাঁদে না"।

প্রচণ্ড জিঘাংসা সঙ্গী করে এক টানে কাভারটা সরিয়ে ফেলল মফিজ। ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের উপর, ছিন্নভিন্ন করে ফেলল ছেলেটাকে, হাজারবার ভোগ করল মেয়েটাকে...

নেই।
ছেলেটা নেই। শুধু মেয়েটা আছে। যেন ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গিয়েছে ছেলেটা।
মেয়েটার মুখে কাপড়। তার মানে গোঙ্গানির শব্দ মেয়েটার নয়। তার মানে...

পিছনে ঘুরল সে। বারো তেরো বছরের এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার সারা গায়ে রক্ত। আরে, মেয়েটাকে তুলে নেবার পর এই ছেলেটাই চিৎকার করে ট্রাকের পিছনে দৌড়াচ্ছিল না ?
এ এখানে এল কিভাবে ?

মফিজ হাত গুটিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। তার শরীর শক্তসমর্থ। এই বারো বছরের বাচ্চাকে কুপোকাত করা তার জন্য কোন ব্যাপারই না।

মফিজ ঘুষি চালাল। ছেলেটা নিচু হয়ে ডজ দিল। মফিজ লাথি চালাল। ছেলেটা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় মফিজের পা ধরে ঘুরিয়ে দিল। মফিজ উড়ে দিয়ে দূরে পড়ল। মফিজ আবার উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে এসে ছেলেটার গলা চিপে ধরার চেষ্টা করল সে।

ছেলেটা মাথাটা শেষ মুহূর্তে ঘুরিয়ে ফেলল, লাফ দিয়ে হাঁটু উপরে তুলে মফিজের উদ্যত দুই হাত এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনল হাঁটুর উপর। মট করে ভেঙ্গে গেল মফিজের দুই কনুইয়ের হাড়। প্রচণ্ড চিৎকারে ধরাশায়ী হল মফিজ।

মফিজ শুয়ে কাতরাচ্ছে। ছেলেটার হাতে একটা তার। ফাঁসের মত করে তারটা নিয়ে আসছে সে। একটু পরে মফিজের প্রাণবায়ু অন্য দুজনের মতই ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল আকাশে।

রেজা দৌড়ে গেল। একটানে শায়লার মুখের বাঁধন খুলে ফেলল সে। শায়লা হাসল।
রেজা বলল, "তোমাকে ভালোবাসি"।
শায়লা বলল, "আমিও ভালোবাসি"।

অতঃপর তারা দুজন হাসল। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য ছিল এটি।

2.

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেলেন তাহমিদ রেজা খান। মাথাটা কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে, আলোর ফুটকি দৃষ্টিসীমার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেমন বমি বমি আসছে।

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাঁচজন মানুষ। ওরা পাঁচজন। প্রথমে কিছু মনে পড়ল না রেজার। কাউকে চিনতেও পারলেন না তিনি।

আস্তে আস্তে তার মনে পড়তে লাগল সব।

****

প্রফেসর মিরাজ আনন্দে শিশুর মত চিৎকার করে উঠলেন। তার এতদিনের সাধনা সফল হয়েছে।

গত পাঁচ বছর ধরে তিনি ও তার চার সহযোগী মিলে যে যন্ত্রটির উপর কাজ করছিলেন আজ তা সফলভাবে কাজ করেছে। পাঁচ বছরের দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় অবশেষে ফলদায়ী হয়েছে।

প্রফেসর মিরাজ যন্ত্রটার নাম দিয়েছেন – "স্বপ্নযন্ত্র"।

স্বপ্নযন্ত্র কেন ? কারণ এই যন্ত্র মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নগুলো বের করে আনে। সব স্বপ্ন না, শুধু এক্সট্রিম পর্যায়ের স্বপ্নগুলো। যে সুখস্বপ্নের প্রতি হাহাকার বেশি সেই স্বপ্নগুলো। যেই দুঃস্বপ্নগুলোর সত্যি হবার আশঙ্কা বেশি সেই স্বপ্নগুলো। শুধু রাতে দেখা স্বপ্ন নয়, জেগে করা কল্পনাগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই যন্ত্র মানুষের বিভিন্ন বয়সের দেখা এক্সট্রিম লেভেলের স্বপ্নগুলো বা করা এক্সট্রিম লেভেলের কল্পনাগুলো নতুন করে দেখায়।

এই যন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল দেবার জন্য মানুষ আহ্বান করা হয়েছিল, চিরস্থায়ী স্মৃতিভ্রম ও মৃত্যুর আশঙ্কা জেনেও তাতে সাড়া দিয়েছিল অনেক মানুষ। তাদের ভিতর থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাহমিদ রেজা খান কে। তাহমিদ রেজা খান একজন ব্যবসায়ী, বলতে গেলে মোটামুটি সফল। উনার মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড লাগিয়েই শুরু হয়েছিল স্বপ্নযন্ত্রের প্রথম সঞ্চালনা।

এই যন্ত্র বেশ জটিল, মাথার চারদিকে বেশ কয়েকটা ইলেকট্রোড লাগাতে হয়, খুলি ফুটো করার দরকার হয় না, লেজার রেডিয়েশন দিয়েই তথ্যের আদান প্রদান এই যন্ত্রে সম্ভব। মানুষটা কি স্বপ্ন দেখছে সেটা দেখানোর জন্য একটা মনিটর আছে, তাতে স্বপ্নটা ভিডিওর মত দেখা যায়। পুরো প্রক্রিয়াটির সময় সাবজেক্টের পালস, বিপি ও অন্যান্য ভাইটাল সাইন খুব সূক্ষ্মভাবে মনিটর করা হয়।

তাহমিদ রেজা খানের উপর পরীক্ষাটা শুরুর আগে প্রফেসর মিরাজের মনে ভয় ছিল, শঙ্কা ছিল। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেলেই শেষ। প্রথম আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল সফল হবার উপর নির্ভর করছে এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ, তার ভবিষ্যৎ, তাদের টিমের ভবিষ্যৎ।

টিম। চিন্তা করতেই একটু আনমনা হয়ে গেলেন প্রফেসর মিরাজ। গত পাঁচ বছর ধরে এই চারজন তার সাথে আছে। রানা, হায়দার, মিলি ও সোফি। সোফি জার্মান। বাকিরা বাংলাদেশি। এর মধ্যে হায়দারের সাথে তার সম্পর্ক বিশেষায়িত, তিনি হায়দারের বাবা। একদম একই রকম চেহারা বাবা ও ছেলের। দুজনেরই পাতলা দেহ, উঁচু ঘাড়, কোঁকড়া চুল, শ্যামলা দেহ, বোঁচা নাক। পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি লম্বা দুজনেই। সবাই বলে, বাপ ছেলের মধ্যেও এমন মিল পাওয়াই যায় না।

তাহমিদ রেজা খান হাসছেন। প্রফেসর মিরাজ মনিটরে স্বপ্নটা দেখেছেন। তাহমিদ রেজা খানের বাচ্চাকালের স্বপ্ন। যেখানে তিনি তার বাল্যের পছন্দের মেয়েটিকে শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

একটু হাসলেন প্রফেসর মিরাজ। এরকম স্বপ্ন কার না থাকে? ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে এমন উদ্ভট স্বপ্ন কে না দেখে?

সবাই দেখে। হাসিটা বিস্তৃত হল প্রফেসর মিরাজের। তিনিও দেখছেন। কিন্তু এখনও কাউকে বলার সময় আসে নি।

এই ট্রায়ালটির টার্গেট ছিল, সাবজেক্টের তিনটি ভিন্ন বয়সের দেখা স্বপ্নকে এক এক করে বের করে আনবে স্বপ্নযন্ত্র। এর মধ্যে প্রথম পার্ট শেষ। শৈশবের স্বপ্ন বের করে আনতে ১০০ ভাগ সফল এই যন্ত্র। তাহমিদ রেজা খান স্বীকার করেছেন, এইরকম কল্পনা তিনি শৈশবে অনেকবার করেছেন এবং এই যন্ত্র তার পুরো কল্পনাকে একদম ঠিকঠাক ভাবেই বের করে আনতে পেরেছে। এই যন্ত্র একটা মাস্টারপিস।

প্রতিটা সেশনের পর সাবজেক্টকে রেস্ট নিতে হয়। কমপক্ষে দুই দিনের রেস্ট। প্রতিটা সেশনে নিউরনের উপর চাপ পড়ে তো, টানা সেশন করলে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হবার আশঙ্কা আছে। এজন্যেই দুটো সেশনের মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে।

তাহমিদ রেজা খানের পরের সেশনটি হল তিন দিন পর। যথারীতি তাকে ইলেকট্রোড পরানো হল, হাতের আঙ্গুলে পালস মনিটরিঙের ক্লিপটা বেঁধে দেয়া হল। যন্ত্রটি চালু করা হল, আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল তাহমিদ রেজা খানের।

আর তার একটু পর, মনিটরটা আলোকিত হয়ে উঠল একটা দৃশ্য দিয়ে। একটা পাহাড়ের ছবি।

****

খাঁড়া পাহাড়টার চূড়া হতে পা হড়কে পড়ে গেল রেজা। নিচে অতল খাদ, অন্ধকার। অনেক নিচ থেকে ভেসে আসছে প্রবহমান পানির শব্দ।

বাঁচার কোন আশা দেখতে পাচ্ছে না সে। দেখতে পাচ্ছে না পতন ঠেকানোর জন্য কোন গাছের ডাল। এভাবে পড়তে থাকলে একসময় সে পৌঁছে যাবে খাদের গোঁড়ায়, তারপর – বুম!

রেজা তার মাথাটা চেপে ধরতে গেল। তখন একটা অবাক ব্যাপার হল। রেজার পতনগতি কেমন হুট করে কমে এল, যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিল। ধাক্কা খেয়ে উল্টেপাল্টে গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল রেজার।

আবার হাতটা বাড়াল রেজা। আবার একই জিনিস হল। দুহাত বাড়াল সে। একই জিনিস হল। উল্টো হয়ে পড়তে পড়তে নিজের হাতের দিকে তাকাল রেজা। অবাক হল। আতঙ্কিত হল। আশান্বিত হল।

তার হাতের জায়গায় হাত নেই, আছে দুটো ডানা। একটা অর্ধ মানুষ অর্ধ পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে রেজা! রেজা তার ডানা দুপাশে ছড়িয়ে দিল। পতনগতি কমে এল চমৎকার ভাবে, রেজা উড়ে চলল সামনের দিকে।

একবার ডানা ঝাঁপটাল সে।
দুবার। তিনবার।

ক্রমাগত ডানা ঝাঁপটাতে লাগল সে। দ্রুত, আরও দ্রুত। মন্থর, আরও মন্থর। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল রেজা, সে উড়তে পারছে। একেবারে পাখিদের মত উড়তে পারছে সে।

অনেকক্ষণ ধরে উড়ল রেজা। পাখিদের সাথে খেলা করল, পাল্লা দিল ওড়াউড়ির। এরোপ্লেনের কাঁচে মুখ লাগিয়ে চুম্বনরত দম্পতিকে চমকে দিল, ককপিটে বসা পাইলটকে কাঁচের বাইরে থেকে একটা স্যালুট দিয়ে এল সে।

সারাদিন ওড়াউড়ি শেষে ক্লান্ত রেজা নেমে এল মাটির দিকে। একটা শহর। অজস্র আলো। একটা রাস্তা ধরে উড়ে যেতে লাগল সে। এই গলি, সেই গলি। হুম, এখানেই।

রেজা একটা বিশেষ বিল্ডিং এর পাশের গলিতে অবতরণ করল। জনৈক হেরোইঞ্চি সেখানে শুয়ে শুয়ে পৃথিবীর ঘনত্ব ও গরুর চোখের গভীরতার সম্পর্ক নিয়ে কাব্যচর্চায় ব্যস্ত ছিল, রেজা খপাত করে তার ময়লা পচা গু লাগা চাদরটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পরে ফেলল।

হেঁটে হেঁটে পাশের সেই বিশেষ বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেল সে। বিল্ডিং এর উপর বড় বড় করে লেখা – "মহাখালী ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সেন্টার"। ভিতরে বহু লোকের সমাগম। তারা হাসছে, খেলছে, গাইছে, এর ওর উপর ঢলে ঢলে গলে গলে পড়ছে।

রেজা দরজা দিয়ে ঢুকতে গেল। দারোয়ান তাকে আটকে দিয়ে বলল, "এখানে কি চাই ? যা ভাগ"।

রেজা তবুও ঢুকতে গেল। দারোয়ান ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিল।

বর-কনে ফটোসেশন করছিল। বরের হাসি হাসি এবং মেয়ের কান্না কান্না চেহারার একের পর এক ফটো তুলছিলেন বিশিষ্ট ওয়েডিং ফটোগ্রাফার জনাব কুদ্দুস শাহরিয়ার শাওন। রেজা সবাইকে পাশ কাটিয়ে চাদর জড়ানো অবস্থায়ই একেবারে স্টেজের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

পুরো কমিউনিটি সেন্টার থেমে গেল। অবাক হয়ে সবাই তাকিয়ে রইল রেজার দিকে। রেজা বলল, "তোমাকে ভালোবাসি"।

বধূবেশি শায়লার চোখ ৩০০ ওয়াট বাল্বের মত জ্বলে উঠল। তার কান্না কান্না মুখ উদ্ভাসিত হল হাসিতে।

শায়লা তার তেত্রিশ কেজি ওজনের গহনা, ১০০ গ্রাম ওজনের শাড়ি, পাঁচ কেজি ওজনের পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হাই হিল ও পঞ্চাশ কেজি ওজনের শরীর নিয়ে রেজার দিকে দৌড়ে আসতে গিয়ে ধুপ্পুস করে স্টেজের উপর পড়ে গেল। কুদ্দুস শাহরিয়ারের ক্লিকের স্পিড বেঁড়ে গেল।

শায়লা বলল, "আমিও ভালোবাসি। উহ, ব্যথা!"
রেজা এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। শায়লা নাক কুঁচকে বলল, "এ মা, কি গন্ধ ! এই নিয়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ ? ছি ছি তাহলে আমি ঐ হোঁতকাটাকেই বিয়ে করব !"
স্টেজে বরের বেশে বসে থাকা হোঁতকা ফোকলা দাঁত বের করে বলল, "ওহ ইয়েস আহ ইয়েস কাম অন বেবি !"

রেজা চাদরটা ফেলে দিল। তারপর সবাই মুখে হাত দিল। কয়েকটা মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কয়েকজন মুরুব্বি মুখে হাত দিয়ে বললেন, "নাউজুবিল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ!" বয়স্ক মহিলারা অন্যদিকে ফিরে পান চিবুতে লাগলেন। বাচ্চারা মনোযোগ দিল মোবাইল গেমে। স্বাভাবিক, ভাবল রেজা, ডানা দেখলে এমন হবে এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তখন একটা মেয়ে বলে উঠল, "অ্যাই দ্যাখ দ্যাখ, মানুষটার হাতের জায়গায় ডানা !"

তখনই যেন সবার হুশ হল। আরে, তাই তো ! এ তো মানুষ না, এ তো পাখি ! পক্ষীমানব !

রেজা ভ্রূ কুঁচকাল। ডানা ওরা দেখল এতক্ষণ পর ? তাহলে এতক্ষণ কি দেখছিল তারা ? রেজা শায়লাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চলো পালাই"।

শায়লা বলল, "ধেত ! পরার মত একটা কাপড় নাই তোমার মত ফকিরের সাথে পালাব আমি ? আমি ঐ হোঁতকাটাকেই বিয়ে করব ! হোঁতকা আই লাভ ইউ জান !"

হোঁতকা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে উঠল। রেজা তাড়াতাড়ি চাদরটা তুলে এনে লুঙ্গির মত পেঁচিয়ে নিল। ছি ! এতক্ষণ ল্যাংটা ছিল সে ? উফ, আসলেই তো ! পাহাড় থেকে পড়ার সময় থেকেই তো সে ন্যাংটা!

তবে কি প্লেনের মধ্যে সেই দম্পতি...থাক, আর চিন্তা করতে চায় না রেজা। এখন বর্তমানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে ।

খাইছে ! স্টেজের সামনে দাঁড়িয়েছেন শায়লার বাবা আলহাজ্ব মইনুল হক কাশেমপুরী। তার হাতে পুরনো আমলের গাদা বন্দুক। ডানদিকে শায়লার মা দুরদানা খানম। তার হাতে উদ্যত হামানদিস্তা, মুখে পান, দাঁতে কালো দাগ।

পিছনে হোঁতকা। হোঁতকার হাতে মোটা বেল্ট। বেল্টের উপর শক্ত শক্ত স্পাইক।
বামদিকে শায়লার ভাই মুরগি মিলন। তার হাতে উদ্যত মুরগি।

প্রথম আক্রমণ করল মুরগি মিলন। হাতের মুরগি ছুঁড়ে দিল সে। রেজার চাদরের নিচের সংবেদনশীল অংশ লক্ষ্য করে মিসাইলের মত ছুটে এল ভয়াল মুরগি। মুরগির ঠোঁট চোখা চোখা। দেখে মনে হয় লাগলে লোহাও ফুটো হয়ে যাবে।

রেজা শেষ মুহূর্তে একপাশে সরে এসে একটা ফ্লাইং কিক মারল। মুরগি উড়ে গিয়ে বিঁধে গেল কুদ্দুস শাহরিয়ারের সংবেদনশীল অঙ্গে। কুদ্দুস শাহরিয়ার "অ্যাঁক" শব্দ করে ধুপ্পুস করে পড়ে গেলেন। তার ক্যামেরা থেকে তখনও ক্লিক ক্লিক শব্দ আসতে থাকল।

এরপর এল হোঁতকা। হোঁতকা "শায়লা আমার হু হু হা হা" করতে করতে মাথার উপর দিয়ে বেল্ট ঘুরিয়ে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ঝাঁকি দিল। সাথে সাথে চার পাঁচটা চোখা স্পাইক ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে রেজার দিকে ধেয়ে আসতে থাকল।

শেষ মুহূর্তে রেজা তার হাত সামনে বাড়িয়ে দিল। একদম "দ্যা ম্যাট্রিক্স" সিনেমায় দেখা কিয়ানু রিভস স্টাইলে। কেউ কাউকে থামতে বললে এভাবে হাত দেখায়।
কিন্তু না, স্পাইকগুলো থামল না। ঘুরতে ঘুরতে সজোরে রেজার গায়ে নিক্ষিপ্ত হল সেগুলো।
শায়লা ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল।
কিন্তু রেজার কিছুই হল না। হোঁতকা অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, "টাকা ছিল না বলে প্লাস্টিকেরগুলো কিনেছিলাম। সব ভেঙ্গে গেছে। হে হে"।

এবার পালা দুরদানা খানমের। দুরদানা খানমের হামানদিস্তা সজোরে উড়ে এল রেজার কপাল লক্ষ্য করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে রেজা লাফিয়ে হামানদিস্তায় কপাল ছোঁয়াল, হামানদিস্তা উড়ে গিয়ে কাঁচের জানালা ভেঙ্গে বাইরে চলে গেল। রেজা চিৎকার করে বলল, "গো-ও-ও-ল! নাইস ক্রস! হোয়াট এ হেডার!"

আলহাজ্ব মইনুল হক কাশেমপুরী তার বন্দুক তুলে গুলি করলেন, রেজা তার ডানাদুটো সামনে এনে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করল। একসময় গুলি শেষ হয়ে গেল, সবাই রেজা আর শায়লার দিকে দৌড়ে আসতে লাগল, রেজা শায়লাকে নিয়ে ভাঙ্গা জানালাটার দিকে দৌড়ে গেল, সবাই চিৎকার করে উঠল, রেজা শায়লাকে নিয়ে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে তার সর্বশক্তি দিয়ে এক লাফ দিল।
নিষ্ফল আক্রোশে জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণকারী দল.....

রেজা পড়তে পড়তে শায়লাকে বলল, "তোমাকে আর কেউ আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কেউ না"।
শায়লা মৃদু হাসল।

“ভালোবাসি”, রেজা বলল।
“ভালোবাসি”, উত্তর এল।

অতঃপর রেজা তার ডানা মেলল। কিন্তু এবার তার পতনের গতি কমল না, নিচ থেকে গতির বিপরীতে ধাক্কাও এল না।

নিজের ডানার দিকে তাকিয়ে দেখল রেজা। কাশেমপুরীর গুলি ডানাদুটোকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এখন কি হবে? কি হবে? হতাশায় মরে যেতে ইচ্ছা করল রেজার। সে আর শায়লা কি তবে এভাবেই মারা যাবে ? শায়লার মৃত্যুর জন্য কি সেই দায়ী হবে ? এভাবে শায়লাকে উদ্ধার করতে না এলে তো আর শায়লা মারা যেত না !
রেজা বলল, “শায়লা আমি সরি। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও”।

শায়লা চুপ করে তাকে জড়িয়ে ধরে রইল। তারা পড়তে লাগল অন্ধকার, অতলান্ত পাতালের দিকে। রেজা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসছে ভয়ানক জমিন।

তিন।
দুই।
এক।
বুম।

কই ? সংঘর্ষ হল না কেন ?

রেজা চোখ খুলল। সে উড়ছে। শায়লার হাতের জায়গায় এখন দুটো ডানা।

পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে তারা এখন। একটা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে তারা। পাহাড়ের উঁচুতে একটা বাড়ি। কাঠের। বাড়ির পাশেই একটা ছোট লেক। আঙ্গিনায় একটা দোলনায়। দোলনায় দুলছে এক দেবকান্তি শিশু।

সেই শিশুর নাক শায়লার মত। মুখ রেজার মত। গলা শায়লার মত। চুলের রঙ রেজার মত। চামড়া শায়লার মত। চোখ রেজার মত।

রেজা হাসল। শায়লা হাসল। অবশেষে। অবশেষে।

****

“ফাটাফাটি! এক্সিলেন্ট!” উচ্ছ্বাসে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন প্রফেসর মিরাজ।

হ্যাঁ, উচ্ছ্বাসের কারণ আছে বৈকি। এইমাত্র সফলভাবে শেষ হল তার যন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ট্রায়ালের দ্বিতীয় সেশন। এবারেও সফল, দুই বলে দুই ছক্কা। একদম সফলভাবে তাহমিদ রেজা খানের যুবা বয়সের স্বপ্নটাও বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে প্রফেসর মিরাজের আশ্চর্য স্বপ্নযন্ত্র।

তাহমিদ রেজা খান নিজেও লজ্জা পেয়ে গেছেন। যুবা বয়সে তিনি যখন ভার্সিটিতে পড়তেন, তখন সবাইকে নিয়ে খুব হাসিঠাট্টা করতেন তিনি। তার সব চিন্তাভাবনাই হাসির দিকে চলে যেত, সবাই তাকে ডাকত “ফানমাস্টার” নামে। আর এই ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, শায়লাকে নিয়ে অবাস্তব এই স্বপ্ন দেখার সময়েও তিনি সিরিয়াসনেস ধরে রাখতে পারেন নি, স্বপ্ন চলে গেছে ফানের দিকে। এই স্বপ্নটার ডিটেইল ভালো মনে ছিল না তার, কিন্তু তবুও এই আশ্চর্য স্বপ্নযন্ত্র ঠিকই তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর থেকে একদম সম্পূর্ণভাবেই তার এই স্বপ্নটা বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে।

তাহমিদ রেজা খানের মনটা একটু খারাপ হল। শায়লা। তার শায়লা। আহারে।

****

মিলি।
হ্যাঁ, মিলি।

বয়সে বছর ত্রিশেক ছোটই হবে মেয়েটা। একটা মেয়ে থাকলে হয়তো মিলির সমানই হত সে।
কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন প্রফেসর মিরাজ।
মিলিকে তিনি বিয়ে করবেন।

ব্যাপারটা মোটেও হাস্যকর কিছু না। হায়দারের জন্মের সময়েই তার প্রথমা স্ত্রী মারা গেছেন। এরপর থেকে তিনিই হায়দারকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে তাকান নি। বাকি জীবন তার নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ই কেটে গেছে।
কিন্তু জীবনের এই পর্যায়ে এসে প্রফেসরের মনে হচ্ছে, তিনি বড় একা। তার একজন সঙ্গী দরকার।
তাছাড়া এখনও এমন কিছু বয়স হয় নি তার। মাত্র তেপ্পান্ন। এই বয়সেও তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ, বউকে সন্তুষ্ট রাখতে সক্ষম তিনি।

পাঁচজনের দলটা গঠন করার সময়ও তিনি মিলির প্রেমে পড়েন নি। মিলি তখন তার চোখে সাধারণ এক নারী ছিল, কাজের প্রতি একাগ্রতা, ভালো রেজাল্ট আর সর্বোপরি ছেলে হায়দারের রিকমেন্ডেশনেই তাকে দলভুক্ত করেছিলেন প্রফেসর। তখনও তিনি জানতেন না, এই মেয়ে হতে যাচ্ছে তার বাকি জীবনের স্বপ্নের রাণী।

মিলিকে এখনও কিছু জানান নি তিনি। তবে মিলি হয়তো বুঝে গেছে। মেয়েরা অনেক কিছুই আগে থেকে বুঝতে পারে। তবে সবার আগে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা দরকার হায়দারের সাথে। হায়দার নিজেই তাকে অনেকদিন ধরে বিয়ের ব্যাপারে বলছে। ব্যাপারটা হাস্যকর শোনালেও সত্যি। ছেলের নিজের বিয়ের দিকে খবর নেই, বাপের বিয়ের দিকে নজরদারি।

প্রফেসর মিরাজ সিদ্ধান্ত নিলেন, এই সপ্তাহেই হায়দারকে সবকিছু খুলে বলবেন। হায়দার নিশ্চয়ই খুশি হবে খবরটা শুনে। হয়তো সেই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর মিরাজ। তার জীবনের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো অবশেষে পূরণ হতে চলেছে।

4.

শহরের উপকেন্দ্রে একটা রেস্টুরেন্ট। সেই রেস্টুরেন্টে একটা টেবিলে বসে আছে ওরা দুজন, হায়দার আর মিলি।

হায়দার আর মিলি মাস আটেক ধরে প্রেমিক-প্রেমিকা। রানা আর সোফি জানে সেটা। জানেন না শুধু প্রফেসর মিরাজ। হায়দার জানত, তার বাবা কাজের ব্যাপারে খুবই কঠোর। সহযোগীদের মধ্যে প্রেম হলে যে প্রজেক্টের বারোটা বাজবে সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানেন। সেইজন্যেই তো প্রজেক্টের কাজ শুরুর সময় সবাইকে কঠোরভাবে বলে দিয়েছিলেন, কাজ করতে এসে প্রেম করা যাবে না, ওসব করতে হলে হয় প্রজেক্টের শেষে করতে হবে, নাহলে এই প্রজেক্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার ভয়েই হায়দার নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার সাহস পায় নি, কিন্তু মন তো আর বাধা মানে না। এইজন্যেই গোপনে মিলিকে নিজের মনের কথা জানিয়েছিল সে, মিলি মাস তিনেক পর হেসে বলেছিল, “হ্যাঁ”।

প্রজেক্ট এখন সফল। স্বপ্নযন্ত্রের আনুষ্ঠানিক ট্রায়ালের তিন ভাগের দু ভাগ শেষ। এখন শুধু তাহমিদ রেজা খানের পরিণত বয়সের স্বপ্ন বের করে আনা বাকি, সেটা আবার অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য দিবালোকে, একটা টিভি চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট হবে পুরো ব্যাপারটা। সবকিছু সফলভাবে করতে পারলে এই যন্ত্রের প্যাটেন্ট বেচে বহু টাকা কামাতে পারবে তারা পাঁচজন, বাকি জীবন তাদের আর কিছু না করলেও চলবে। ন্যাশনাল হিরো হয়ে যাবে তারা সবাই।

হায়দার মিলির হাত ধরল। মিলি সে হাত সরিয়ে নিল না। হায়দার ঠিক করল, আর দেরি নয়। আজকেই বাবাকে মিলির কথা বলতে হবে। আজকেই।

****

বাবা আর ছেলে ডিনার করছেন। পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে।
উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন প্রফেসর মিরাজ। তার মনে শঙ্কা, আনন্দ, ভয়। ছেলে কিভাবে নেবে ব্যাপারটা? মেনে নেবে নাকি নেবে না ? কি অনুভূতি হবে তার ?

ওদিকে হায়দারের অবস্থাও খারাপ। বাবা কি মানবেন ? না মানার অবশ্য কোন কারণ নেই। প্রজেক্টের সবাইকে নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করেন তিনি। তাছাড়া, হায়দারেরও বয়স কম হয় নি। সাতাশে পা দিয়েছে সে দুমাস আগেই।

হায়দার বলতে গেল, “বাবা...”
বাক্যটা শুরু করতে পারল না সে। তার আগেই প্রফেসর মিরাজ বলে উঠলেন, “হায়দার, তোমাকে একটা কথা বলতাম”।

ভ্রূ কুঁচকে গেল হায়দারের। নিজের কথায় বাধা পেয়ে ঈষৎ হতাশ হল সে। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করেছিল সে, এখন আবার কখন সাহস পায় কে জান ে?

“বল বাবা”।
“আমি বিয়ের কথা ভাবছি”।

হায়দার অবাক হল। এতই অবাক হল যে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

“কি বললে বাবা ?”
“আমি বিয়ের কথা ভাবছি হায়দার। আমার বিয়ে”।

হায়দার হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বাবা বিয়ে করলে তার কোন সমস্যা নেই। সে নিজেও চায় তার বাবা আবার বিয়ে করুক, বাবাকে সবসময় সঙ্গ দেবার মত কেউ আসুক। সে নিজেই অনেকবার বাবাকে বিয়ে করতে বলেছে। কিন্তু আজ...এখন ? এখন এই ব্যাপারটা উঠবে চিন্তাও করতে পারে নি হায়দার।

“কাউকে কি পছন্দ হয়েছে বাবা ?”
“হ্যাঁ”।

হায়দার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকাল। প্রফেসরের মুখে মিটিমিটি হাসি।

"কে সে ? আমি চিনি ?"
"চেনো"।

হায়দার স্মৃতি হাতড়ানো শুরু করল। কে সে ? বাবা যখন নিজের জন্য পছন্দ করেছে, বয়স নিশ্চয়ই ফর্টির কাছাকাছি হবে। থার্টি ফাইভও হতে পারে। কে সে ? ঘুরে ঘুরে অনেকের কথাই এল হায়দারের মাথায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের চিন্তা নাকচ করে দিল সে।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরেও একটা নামও আন্দাজ করতে সমর্থ হল না হায়দার। অবশেষে পরাজয় বরণ করে সে বলল, "কে সে, বাবা?"

"শুনবে ?"
"অবাক হবে না তো ?"
"এটা না শুনলে কিভাবে বলব ?"
"না তুমি কথা দাও অবাক হবে না"।
অবাক যা হয়েছি এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব নয়, ভাবল হায়দার। বলল, "আচ্ছা কথা দিলাম অবাক হব না"।
"কথা দাও তুমি এর সাথে আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করবে"।
"আচ্ছা কথা দিলাম"।
"মেয়েটা হচ্ছে, মিলি"।

হায়দারের মনে হল তার মাথার উপর প্রচণ্ড বজ্রপাত হয়েছে। যেন প্রচণ্ড এক গদা দিয়ে কেউ তার মাথা ভেঙ্গে দুই ভাগ করে দিয়েছে। যেন প্রচণ্ড এক তরবারির খোঁচায় কেউ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তার হৃদয়কে। যেন কয়েক হাজার ভোল্টের শক্তিশালী বিদ্যুতে পুড়িয়ে কেউ ভাজা ভাজা করে দিয়েছে তার শরীরের প্রতিটি কোষকে।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল হায়দার।

প্রফেসর মিরাজ বললেন, "কি হল ? কি হল তোমার ?"
অতঃপর মাথা তুলল হায়দার, মুখে তার নকল, মেকি হাসি। "খুশি হয়েছি বাবা, মহাখুশি আমি আজ"।

5.

"মেরে ফেল"।
"হোয়াট ?"
"মেরে ফেল। বুড়ো ভামটাকে মেরে ফেল"।

হায়দার মাথা নিচু করে নিজের পায়ের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আগে মিলিকে সবকিছু জানিয়েছে সে। মিলি শুনে প্রথমে অবাক হয়েছে, পরে রেগে গেছে প্রচণ্ডভাবে। সে কল্পনাই করতে পারছে তার বাবার বয়সী লোকটার এতটা স্পর্ধা হবে। প্রজেক্টের সুপারভাইজর বলেই কি সে তাকে কিনে নিয়েছে নাকি? তাছাড়া ছেলের সামনে এ কি ধরণের নির্লজ্জতা? ছি ছি ছি। ভাবতেই পারছে না মিলি। বুড়ো ভাম প্রফেসরের কথা কল্পনা করতেই একটা ঘিনঘিনে কোলাব্যাং মানসপটে ভাসছে তার।

হায়দারকে একটু একটু ভালোবাসে সে। হায়দার ভালো ছেলে। হায়দারকে বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই তার। কিন্তু সবকিছুতে ভজকট পাকিয়ে দিল এই বুড়ো ভামটাই।

"মিলি, আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলব। তারপর আমরা চলে যাব অনেক অনেক দূরে। জীবনে আর বাবার সামনে পড়তে হবে না তোমাকে"।
"তোমার যা ইচ্ছা কর!"

রাগে গজরাতে গজরাতে চলে গেল মিলি। হায়দারের মাথা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

****

আনুষ্ঠানিক ট্রায়ালের তৃতীয় অংশ শুরু হতে এখনও দশ দিন বাকি। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রদর্শনীর জন্য অডিটোরিয়াম সাজানো, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ, টিকেট বিক্রি ইত্যাদি কারণে এটা হতে এত দেরি হচ্ছে।

হায়দার আর প্রফেসর মিরাজ মুখোমুখি। হায়দারই তার বাবার স্টাডিতে এই অসময়ে কথা বলতে এসেছে। প্রফেসর একটু অবাক হয়েছেন, পরক্ষণেই খুশি হয়েছেন। হায়দার নিশ্চয়ই মিলির ব্যাপারে বলতে এসেছে। এ কথা ও কথা ঘুরে হায়দার চলে গেল আসল কথায়।

"বাবা, মিলি..."
"কি ?"
"মিলিকে আমি..."

"কি ?"
"মিলিকে আমি ভালোবাসি, বাবা"।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে হায়দার। সে যেন অনেক দিন আগের ছোট শিশুটি হয়ে গেছে, ভুল করলে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে বাবার বকা খেত। পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে না পারলে যে ছেলেটি লজ্জায় বাবাকে মুখ দেখাতে পারত না। ভয় পেলে যে দুহাত দিয়ে সজোরে বাবাকে আঁকড়ে ধরত।

অনেক দিন আগের সেই ছেলেটি যেন হয়ে গেছে হায়দার। অনেক ক্ষণ কেটে গেল। অনেক, অনেক ক্ষণ। কেউ কোন কথা বলল না।

তারপর হায়দার চোখ তুলল। কাঁদছে সে। সে তার বাবাকে সুখী করতে পারে নি। যে বাবা তাকে সারাজীবন আগলে রেখে মানুষ করে তুলেছেন সেই বাবার সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই।

প্রফেসর মিরাজ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবা ছেলেতে আর কোন কথা হল না। কথার দরকারও ছিল না তাদের মাঝে।

****

মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিল। সব পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করত সে।
মেয়েটির পরিবার ছিল খুবই গরীব। উৎসবে নতুন জামা কিনে দেবার সামর্থ্য মেয়েটির বাবার ছিল না। স্কুলের স্যারদের দয়ায় তাকে নতুন ক্লাসের বইগুলো সংগ্রহ করে নিতে হত।

মেয়েটির বয়স যখন পনের, মেয়েটির মার তখন ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক টাকার। অনেক অনেক টাকার। এত টাকা দেবার সাধ্য মেয়েটির বাবার ছিল না। টাকার অভাবে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় মেয়েটির মা।

মায়ের মৃত্যুর দিনে একটা প্রতিজ্ঞা করে মেয়েটা। কঠিন প্রতিজ্ঞা। সে জীবনে অনেক টাকার মালিক হবে। অনেক অনেক টাকার মালিক।

স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে ভার্সিটি। ভার্সিটি থেকে গবেষণা। মেয়েটি কখনই তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও নড়ে নি। বরং দিন দিন সে আরও দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। টাকার জন্য এমন কিছু নেই, যেটা সে করতে পারে না। এমনকি মানুষ খুন করতেও তার কোন আপত্তি নেই।

আর ঠিক সে কারণেই, গল্পের এ পর্যায়ে আমরা ঐ মেয়েটাকে, মানে মিলিকে, মিটিমিটি হাসতে দেখতে পাচ্ছি।

***

ট্রায়ালের তৃতীয় অংশের ঠিক আগের রাতে প্রফেসর মিরাজকে নিজ বিছানায় মৃত পাওয়া গেল। প্রফেসর মিরাজের টেবিলে রাখা ছিল সায়ানাইডের শিশি। তার নিচে ছিল একটা সুইসাইড নোট। নিজের হাতের লেখায় প্রফেসর মিরাজ লিখে গেছেন, ছেলের সাথে এমন একটা ঘটনায় জড়িয়ে চরমভাবে লজ্জিত তিনি। এতটাই লজ্জিত যে এ জীবন রাখার আর কোন সাধ নেই তার। তাই বেছে নিয়েছেন সুইসাইডের পথ।

পুলিশ এসে প্রফেসরের বেডরুম সিল করে দিল, ফরেনসিক এক্সপার্টরা মৃতদেহ ও আশেপাশের সমস্ত আলামত জব্দ করে নিয়ে গেল। হায়দার কাঁদতে থাকল, সেই সাথে কাঁদল মিলি, রানা, সোফি, সবাই।

ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। সারা দেশের মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেল। যারা তাকে চিনত বা চিনত না সবাই এই দুঃখজনক ঘটনায় বেদনায় মুষড়ে পড়ল। এমনকি দেশের প্রধান কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ট্রায়ালের তৃতীয় অংশের প্রদর্শনী এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। এই এক সপ্তাহে চারটা ঘটনা ঘটল। এক, প্রফেসর মিরাজের দাফনকার্য সম্পন্ন হল। দুই, সায়ানাইডের শিশিতে হায়দারের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেল। তিন, প্রফেসর মিরাজের হাতের লেখার সাথে হায়দারের হাতের লেখার প্রচণ্ড মিল পাওয়া গেল। চার, উইল ঘেঁটে দেখা গেল, মারা গেলে এই প্রজেক্টের পুরো দায়িত্ব এবং সিংহভাগ আয়ের প্রাপক হবে হায়দার।

আর ঠিক এসব কারণেই, ট্রায়ালের তৃতীয় অংশের প্রদর্শনীর ঠিক এক দিন আগে, পুলিশ কর্মকর্তা জন স্টেইনবেক হায়দারের কানে ফিসফিস করে বললেন, “এখন আপনার জীবন সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে আগামীকাল আপনার যন্ত্র কেমন পারফর্ম করে তার উপর। যদি আপনার যন্ত্র ওকে হয়, এটা সারা পৃথিবীতে একটা রিভলিউশন সৃষ্টি করবে, সরকার কখনই চাইবে না আপনার মত এমন একটা মেধাকে জেলে পচতে দিতে। কারণ সরকার চেঞ্জ হলে নেক্সট সরকার আপনাকে বের করে আরও একটি প্রজেক্টে লাগিয়ে দিয়ে আরও একটা জগৎবিখ্যাত আবিষ্কারের সাক্ষী হতে পারে, যেটা বর্তমান সরকার কখনই চাইবে না। তাই আপনার যন্ত্র ওকে হলে, আপনার কেসে আপনি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন”।

হায়দার বলল, “আর যদি ওকে না হয় ?”
পুলিশ কর্মকর্তা হাসলেন। বললেন, “প্রার্থনা করুন যেন আপনার যন্ত্র কাজ করে, মিস্টার হায়দার। মানে আপনার যন্ত্র না, ঐ যন্ত্র হাহাহা”।

অশ্লীল জোকটা গায়ে মাখল না হায়দার। যেন উচ্চমানের কোন রসিকতা হয়েছে এই মনে করে অতি কুৎসিতভাবে হাসতে লাগলেন পুলিশ কর্মকর্তা জন স্টেইনবেক।

6.

পরদিন।

গ্র্যান্ড হলরুমে মানুষ যেন ফেটে পড়ছে। তিল ধারণের জায়গা নেই যেন। আয়োজকেরা মহাখুশি।

সাবজেক্ট তাহমিদ রেজা খানকে একটা কাঁচের ঘরে রাখা হয়েছে। তাকে ইলেকট্রোড পরানো হচ্ছে। কাঁচের ঘরটা সর্বসাধারণ খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছে।
যন্ত্র সঞ্চালনা শুরু হল। তাহমিদ রেজা খান ঢলে পড়লেন ঘুমের দেশে।

একটু পরে জায়ান্ট মনিটরে ভেসে এল ছবি। একটা সাগর।

****

সাগরপাড়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে রেজা। তার হাত ধরে বসে আছে শায়লা। রেজা বুড়িয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। পেশিতে আগের মত জোর নেই। দুইটা দাঁত পড়েও গেছে। শায়লারও একই অবস্থা। তার মুখটাও কুঁচকে গেছে। বার্ধক্যের ছাপ সারাদেহে স্পষ্ট।

রেজা বলল, “মনে আছে আমি বলেছিলাম, উই উইল গ্রো ওল্ড টুগেদার ?”
শায়লা হেসে বলল, “মনে আছে”।
রেজা বলল, “মনে আছে আমি বলেছিলাম, উই উইল ডাই ওল্ড টুগেদার ?”
শায়লা হেসে বলল, “মনে আছে”।

রেজা কেশে উঠল। কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে এল এক ঝলক। বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত হল না শায়লা। পরম স্নেহে মুছিয়ে দিল রক্ত।

রেজা জানে এরপর কি হবে। কাশি বাড়বে। রক্ত আর মিউকাস বাড়তে থাকবে কাশির সাথে। একসময় শ্বাসকষ্ট শুরু হবে। তারপর শুরু হবে খিঁচুনি। পা থেকে শুরু করে সেই খিঁচুনি উঠতে থাকবে উপর দিকে।

একসময় খিঁচুনি আক্রান্ত করবে শ্বাস নেবার পেশিগুলোকে। তখন শুরু হবে চূড়ান্ত শ্বাসকষ্ট। অতঃপর মারা যাবে রেজা। পৃথিবী থেকে মুছে যাবে সে, চিরতরে।

ভাইরাসটির নাম টি-সেভেন। এই উদ্ভট নামের মানে জানে না রেজা। সে শুধু জানে, পৃথিবীর গোপন একটা ল্যাবরেটরিতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অ্যাম্পুল ভেঙে মুক্ত হয়ে যায় এই শক্তিশালী ভাইরাস। অতঃপর ছড়িয়ে পরে বাতাসের মাধ্যমে, নিমিষেই আক্রান্ত করে লাখো কোটি মানুষকে।

ভাইরাসে আক্রান্তেরা খুব বেশি হলে পাঁচদিন বাঁচে, প্রথম দিন হঠাৎ করে জ্বর উঠেই নেমে যায়, রেজার যে লক্ষণ সেটা হয় চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে। হিসেবে রেজার আয়ু আছে আর কয়েক ঘণ্টা, শায়লার খুব বেশি হলে এক দিন।

রেজার কাশি বাড়ছে। শায়লা তার হাত ধরে বসে আছে। তাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তারা একই সাথে, পরস্পরের সান্নিধ্যে, পরস্পরের হাত ধরে, পরস্পরের বুকে মাথা রেখে মারা যাবে। এমন ভাগ্য কজনের হয় ?

কাশি।
শ্বাসকষ্ট।
খিঁচুনি।

রেজার বুকে মাথা রেখে শুয়ে রইল শায়লা। সাগরের ঢেউ এসে তাদের ভিজিয়ে দিতে লাগল।
রেজার শেষ মুহূর্তে সে বহুকষ্টে ফিসফিস করে বলল, "ভালোবাসি"।
শায়লা হাসিমুখে বলল, "ভালোবাসি"।

পড়ন্ত বিকেল। সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর শেষ মানবের বুকে মাথা রেখে ম্লান হাসিতে ভাস্বর হয়েছে পৃথিবীর শেষ মানবীর মুখমণ্ডল। সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ওদের উপর। আলতো করে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদের।

****

তাহমিদ রেজা খানের দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। সবার সামনে অঝোর ধারায় ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছেন তিনি।

উপস্থিত সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। স্বপ্নযন্ত্র নিঃসন্দেহে মানুষের এক অসাধারণ আবিষ্কার, এতে আর কারও সন্দেহ নেই। এত স্পষ্ট, এত জীবন্ত করে কোন যন্ত্র কোনদিন মানুষের স্বপ্ন বের করে আনবে তা কে কবে ভেবেছিল ?

হায়দার হাসছে। এই যন্ত্র সফল। পুরোপুরি সফল। তাকে আর বাবাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ কাঁধে জেলে পচতে হবে না।

মিলি হাসছে। এই যন্ত্র সফল। পুরোপুরি সফল। এই যন্ত্র এখন হবে টাকার খনি। তবে বুড়োটার মত ওর ছেলেকেও ফাঁসাতে পারলে ভালো হত। ভালবাসার চেয়ে টাকা অনেক বড়। টাকাই তার একমাত্র ভালোবাসা।
রানা হাসছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তার।
সোফি কাঁদছে। প্রফেসরের কথা মনে করে কাঁদছে সে। প্রফেসর তাকে মেয়ের মত স্নেহ করতেন। কিন্তু সোফি প্রফেসরকে ভালবাসত। এতটাই ভালবাসত যে সে প্রফেসরকে একবার বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিল।

একটু ধাতস্থ হবার পর তাহমিদ রেজা খানকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হল। প্রথম সাংবাদিক জিজ্ঞেস করল, "স্বপ্নযন্ত্রে নিজের দেখা স্বপ্ন নতুন করে দেখে আপনার অনুভূতি কি ?"
"অসাধারণ অনুভূতি। এত জীবন্ত করে দেখলাম সবকিছু...এই স্বপ্ন যে আমি কতবার দেখেছি..."
"আমাদের জানানো হয়েছে গত দুটো স্বপ্নই আপনি একই নারীকে নিয়ে দেখেছেন। অর্থাৎ সবসময়েই আপনি একই নারীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি কি আপনার স্ত্রী?"
"হ্যাঁ আমরা বিয়ে করেছিলাম"।
"তারপর? তিনি কি জীবিত আছেন?"
"হ্যাঁ"।
"তিনি কি এসেছেন?"
"না"।
"আপনারা কি এখনও বিবাহিত?"
"হ্যাঁ"।
"তিনি কি অসুস্থ?"
"না"।
"তাহলে? আপনার স্বপ্নের মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে আপনার স্ত্রীকে আপনি অনেক বেশি ভালোবাসেন, আপনার বিভিন্ন বয়সে আপনার স্ত্রীই ছিল আপনার স্বপ্নের রাণী। কিন্তু আজ এই ঐতিহাসিক ঘটনার দিনে তিনি কোথায় ? আসেন নি কেন ?"
তাহমিদ রেজা খান এই প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। হঠাৎ বললেন, "আমার খুব অসুস্থ লাগছে, আমি যাব"। তাকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

পুলিশ অফিসার জন স্টেইনবেক হাতের তালু চুলকাতে লাগলেন। গত রাতে তার বস ফোন করে একটা কথা বলেছিলেন। এখন ঐ প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে হবে....

তবে সবার আগে, হায়দারকে স্যার বলতে হবে। হাজার হোক, এত বড় বিজ্ঞানী, বাপ্রে বাপ !

***

ঘটনার তিন দিনের মধ্যে স্বপ্নযন্ত্র ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নাম পৃথিবীর মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

বাঘা বাঘা দেশের প্রধানেরা তাদেরকে নিজেদের দেশে বিপুল টাকার আশ্বাস দিয়ে নতুন গবেষণা শুরু করতে বললেন। স্বপ্নযন্ত্রের স্বত্ত্ব কিনে নেবার জন্য সারা পৃথিবীর মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। এমন অস্বাভাবিক দাম উঠল এটার যেটা ভাগাভাগি করে নিলেও প্রত্যেকের চৌদ্দগুষ্ঠি রাজার হালে থাকতে পারবে।

পৃথিবীর প্রায় সারা দেশের অনেকগুলো পত্রিকার হেডলাইন হল এই স্বপ্নযন্ত্র। কোটি কোটি কলাম লেখা হল এই যন্ত্র নিয়ে, কোটি কোটি স্ট্যাটাস দেয়া হল এই যন্ত্র নিয়ে।

আর ঠিক চতুর্থ দিনের মাথায় একটা ঘটনা ঘটল। তাহমিদ রেজা খান আত্মহত্যা করলেন। তিনি তার সুইসাইড নোটে লিখলেন, "আমি সারাজীবন যে মেয়েটাকে কল্পনা করেছি, আমি তাকেই বিয়ে করতে পেরেছি। আমি সবই পেয়েছি, শুধু ভালোবাসা পাই নি। সে আমাকে কখনই ভালোবাসে নি। এতদিন আমি ভালোবাসা ছাড়া তাও কোনভাবে বেঁচে ছিলাম, ওকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো নতুন করে দেখার পর থেকে আমি আর কোনভাবেই ওকে সহ্য করতে পারছি না। বিশেষ করে শেষটা দেখার পর তো না-ই! কল্পনার ও আর বাস্তব ও-র মধ্যে এত তফাত! কল্পনার ও আমায় কত ভালোবাসে! আর বাস্তবের ও ঘৃণাই করে শুধু! কেন দেখলাম এই স্বপ্ন? কেন গেলাম স্বপ্নযন্ত্রে নতুন করে পুরনো স্বপ্ন দেখতে? আগে তো তাও কোনভাবে বেঁচে ছিলাম, এবার তো আর বেঁচে থাকা সম্ভব না। কোনভাবেই না। আমি চোখ বন্ধ করলেই দেখছি ও আমায় ভালবাসছে। আর খুললেই দেখছি ওর চোখে ঘৃণা। ওহ গড, আমি কিভাবে বেঁচে থাকব! কেন দেখলাম এই স্বপ্নগুলো ! কেন ? কেন ? কেন ?

আমার মৃত্যুর জন্য স্বপ্নযন্ত্র দায়ী। শুধুই স্বপ্নযন্ত্র দায়ী"।

সুইসাইড নোটটি কাগজে নয়, নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে স্ট্যাটাস হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন তাহমিদ রেজা খান। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছিল।

একদিনের মধ্যে কয়েক লাখের উপরে শেয়ার হয়েছিল স্ট্যাটাসটা।

****

তিনদিনের গড়ে ওঠা সমস্ত খ্যাতি মিলিয়ে গেল ত্রিশ মিনিটেই।

যে স্বপ্নযন্ত্র একটু আগেও ছিল সবার আরাধ্য বস্তু, সাধনার ধন, সেই যন্ত্র হঠাৎ করেই হয়ে গেল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য যন্ত্রে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তুতে।

আন্তর্জাতিক হিরো থেকে ওরা সবাই হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ভিলেন। হায়দারকে তড়িঘড়ি করে গ্রেফতার করা হল। মিলি আর রানার উপর রেস্টুরেন্টে হামলা হল। সোফি তার সব চুল কেটে ফেলে নিজের দেশ জার্মানিতে পালিয়ে আত্মগোপন করে রইল।

স্বপ্নযন্ত্র ধ্বংস করে দিতে চাপ এল সরকারের উপর। প্রবল চাপ।
অতঃপর একদিন কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিল ওদের ল্যাবরেটরিতে। মিলি এবং রানা ভিতরে থাকা অবস্থায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।
হায়দারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল।

স্বপ্নযন্ত্রের কোন খোঁজ আর পাওয়া গেল না। পাঁচ বছরের এত পরিশ্রম, এত অধ্যাবসায়ই হল ওদের ধংসের কারণ।

পরিশিষ্টঃ

মাথা থেকে ইলেকট্রোড খুলে ফেলল সে। আতঙ্কে জমে গেল তার হাত পা।

যা দেখেছে তা সে আগে ভাবে নি তা নয়। ভেবেছে। কিন্তু এত ডিটেইলে নয়। এতগুলো খারাপ সম্ভাবনা বিচ্ছিন্নভাবে তার মাথায় আগেই এসেছে ঠিকই, কিন্তু একসাথে নয়।

কিন্তু আজ এ কি দেখল সে ?
কি দেখাল তার স্বপ্নযন্ত্র !
সমস্ত খারাপ চিন্তা, সমস্ত ভয়, সমস্ত আশঙ্কা নিয়ে এত নাটকীয় করে কিভাবে দেখাল স্বপ্নযন্ত্র?
কিন্তু...স্বপ্নযন্ত্রের তো সাধ্য নেই নতুন করে কিছু বানানোর। খালি মস্তিষ্কের কোণে লুকোনো দৃশ্যটাকেই সে বের করে আনতে পারে।
তবে কি তার মস্তিষ্ক বিশ্বাস করে সামনে এতকিছু ঘটতে যাচ্ছে ?
তবে কি তার মস্তিষ্ক দুর্ঘটনার ভয়ে ভীত ?
নাকি স্বপ্নযন্ত্র তার অজান্তেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর অধিকারী হয়ে গেছে ?
কিন্তু সেটাও বা কিভাবে সম্ভব ?

স্বপ্নযন্ত্র বানানোর সময় সে এভাবেই বানিয়েছিল, যাতে মস্তিষ্কের সবচেয়ে এক্সট্রিম চিন্তাগুলোই স্বপ্ন হয়ে বের হয়ে আসে। হতে পারে সেটা ভালো চিন্তা, হতে পারে সেটা খারাপ চিন্তা। খারাপ ভালো বাছাবাছির ক্ষমতা স্বপ্নযন্ত্রের নেই, এই ক্ষমতা যন্ত্রটাকে কিভাবে দিতে হবে সেও জানে না।

কি হবে যদি স্বপ্নযন্ত্র এভাবে সবার মনের কালো অধ্যায়গুলোই বের করে আনে ? কি হবে যদি স্বপ্নযন্ত্র কাউকে আশার বাণী না শোনায় ? কি হবে যদি স্বপ্নযন্ত্র কাউকে ভালো স্বপ্ন না দেখায় ? কি হবে যদি স্বপ্নযন্ত্র মানুষকে শুধু দুঃস্বপ্নই দেখায় ?

সেই দুঃস্বপ্ন-যন্ত্র মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবে ?
কেউ কি টাকা দিয়ে দুঃস্বপ্ন কিনতে চাইবে ?
স্বপ্নযন্ত্র কি আদৌ গ্রহণযোগ্যতা পাবে ?
স্বপ্নযন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি ?

সুতীব্র চিন্তায় ডুবে গেল মানুষটা। আশঙ্কা, শুধু আশঙ্কা তার মনে।
পাতলা দেহ, উঁচু ঘাড়, কোঁকড়া চুল, শ্যামলা দেহ, বোঁচা নাক মানুষটার।
পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি লম্বা মানুষটা।

========================O=====================

সেঁজুঁতি পাবলিকেশন্সের পক্ষে এই বইটি তৈরি করেছেন–

Forhad Ahmed Niloy

আরো বই পেতে আমাদের ওয়েভ সাইট ভিজিট করুন।